দিশারী
মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন
মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন

দিশারী

মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন

দিশারী
মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন

© স্বত্ব: প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২

সম্পাদনা সহযোগিতায়
ডঃ আবু বকর রফীক

গ্রন্থনা ও প্রকাশনায়
ক্যাপ্টেন সাখাওয়াত কমল
ব্লু ক্যানোপাস, গেইট # ১০, বাড়ি # ৭, রোড # ১০, ব্লক # কে
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, হালিশহর, চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ
সাওসান সুহা
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ২০১৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
নকশা
www.nokshaworld.com

মূল্য: ২৫০ টাকা

প্রকাশকের কথা

লেখক হিসেবে আমার বাবা মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন আমার কাছে একটা বিস্ময়!

কেন, সেটা বলছি। নাতিদীর্ঘ এ লেখাটাই আমার জানামতে তাঁর একমাত্র রচনা। সেই ১৯৭৬ সালে, তখন তাঁর বয়স চল্লিশ প্রায়। নিজ ডায়েরিতে মনের খেয়ালে এ প্রবন্ধটি লিখে রেখেছিলেন। কখনো আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি। আমি ডায়েরিটা হাতে পাবার পর এক বসাতেই পড়ে ফেললাম, পুরোটা। সেটাও ২০০৬ সালের কথা। ছোটবেলা থেকেই কিছুটা অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান-পিপাসু আমি সুযোগ পেলেই পড়াশুনা করি। বিভিন্ন বিষয়ে জানার পরিধিটা বাড়ানোর চেষ্টা করি। এ লেখাটা পড়ার পর লেখকের জ্ঞানের পরিধি বুঝতে পেরে অবাক হলাম! ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও সমকালীন রাজনীতি নিয়ে ওঁর আধুনিক চিন্তাধারা পাঠকই বিচার করবে। ভাবলাম, এ লেখাটা সংরক্ষণ করা দরকার। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অনেক সময় গড়িয়ে গেল। কম্পোজ করার পর পড়তে গিয়ে লেখকের উল্লেখ করা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত আমার জানা না থাকায় তথ্যপ্রযুক্তির বেশ সহায়তা নিতে হয়েছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক-গবেষক ও সমাজকর্মী শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফীক সম্পর্কে আমাদের চাচা। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি প্রবন্ধটি আদ্যন্ত দেখে দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশনা ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান 'নকশা' পরিবারকে এ বইয়ের সংকলন, কম্পোজ, প্রুফ দেখা সহ সকল কাজে আমাদের পাশে পেয়েছি। বাস্তবধর্মী প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইনের জন্য আমাদের ভাগ্নী সাওসান সুহা'কে অনেক ধন্যবাদ।

স্রষ্টা, সৃষ্টি, বিজ্ঞান, ধর্ম, বিবিধ মতবাদ ও মানবতার মুক্তির পথ নিয়ে রচিত যুগোপযোগী লেখাটি পাঠকের মনের খোরাক যোগাবে নিশ্চয়। অনেকের চোখ খুলে দেবে, সেই সাথে অনেক প্রশ্নের জবাবও মিলবে। সর্বোপরি, তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা আদর্শ রচনা হয়ে উঠবে– এ আমাদের বিশ্বাস। পঙ্কিলতা চিড়ে আলোর উন্মেষ ঘটায় যে, সে-ই "দিশারী"। সে হিসেবে লেখক কর্তৃক বই-এর নামকরণ যথার্থ বলে মনে করি।

ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত নিবেদন জানাই।

১০ অক্টোবর ২০২২
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

সাখাওয়াত হোছাইন কমল

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও পরিবার

মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন ১৯৩৯ সালের ১ আগস্ট দক্ষিণ চট্টগ্রামের তৎকালীন সাতকানিয়া থানাধীন চুনতি গ্রামের সিকদার পাড়াস্থ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, কলিকাতা মাদ্রাসার এম. এম. গোল্ড মেডালিস্ট, প্রসিদ্ধ চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহতামীম (অধ্যক্ষ) মাওলানা নুরুল হোছাইন ও মাতা শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী মরিয়ম খাতুন। ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে লেখক ছিলেন সবার বড়। অন্য ভাইয়েরা হলেন মরহুম মোশফেক হোছাইন (ব্যবসায়ী), ডাঃ ওয়াজাহাত হোছাইন (ঢাকা মেডিকেল কলেজ), মরহুম নোমান হোছাইন (ব্যবসায়ী) ও মরহুম প্রফেসর ড. ইমরান হোছাইন (সাবেক ডীন, কলা অনুষদ ও সাবেক চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। আর বোনেরা হলেন মরহুমা শওকত আরা ও সুলতানা রাজিয়া মঞ্জু।

শিক্ষাজীবন

লেখকের শিক্ষাজীবনের বড় অংশ জুড়ে আছে চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা। ১৯৫২ সালে আলীম ও ১৯৫৪ সালে ফাযিল পাশ করার পর আরবী মাধ্যমে পড়াশোনার ইতি টানেন। ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা তাঁর। মাদ্রাসায় স্নাতক উত্তীর্ণের পর তিনি ভর্তি হন চট্টগ্রাম শহরের ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম)। সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৫৮ সালে। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেন ১৯৬০ সালে। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা থেকে বি.এড. সম্পন্ন করেন ১৯৬৫ সালে।

ব্যক্তি ও কর্মজীবন

১৯৬০ সালের ৭ জুন তৎকালীন সাতকানিয়া থানার (বর্তমান লোহাগাড়া উপজেলা) অন্তর্গত পদুয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব হাকিম বকশ্ এর দ্বিতীয় কন্যা লায়লা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী পোর্ট ট্রাস্ট হাইস্কুল (পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়) এ যোগদান করে সেখানেই শেষ করেন চাকুরীর পুরো মেয়াদ। অবসর নেন ১৯৯৭ সালের ২৯ জুলাই। চট্টগ্রাম বন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকুরীকালীন সময়ে লেখক সপরিবারে বিদ্যালয় সংলগ্ন আবাসিক এলাকা পোর্ট হাইস্কুল কলোনীতে বসবাস করেন। ২০০২ সালে তিনি পবিত্র হজ্জ্ব সম্পাদন করেন। ২০০৩ সালে উত্তর হালিশহর ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী আবাসিক এলাকাস্থ নিজ বাসভবনে স্থানান্তরিত হন। লেখকের স্ত্রী, ৬ পুত্র যথাক্রমে জাহেদ হোছাইন, জাবেদ হোছাইন, ইফতেখার হোছাইন মিঠু, সাজ্জাদ হোছাইন কচি, সাখাওয়াত হোছাইন কমল, ইকবাল হোছাইন ও ১ কন্যা নাজমুন নাহার নাজমা সপরিবারে চট্টগ্রাম শহরে বসবাস করেন।

ইন্তেকাল

১৭ জানুয়ারী ২০০৪ সালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লেখক মুহাম্মদ এশফাক হোছাইন চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। নিজ গ্রামে পারিবারিক কবর স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রাক কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ পুস্তিকার রচয়িতা মরহুম মৌলানা এশফাক হোছাইন ছিলেন একজন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ। তিনি ছিলেন সুস্থ চিন্তা, বিশুদ্ধ বিশ্বাস, ভাবসাম্যপূর্ণ মেজাজ এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ব্যক্তি।

'দিশারী' শিরোনামের এ পুস্তিকাটি তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই মুসাবিদা আকারে তৈরি করে গিয়েছিলেন। তাঁর সন্তানেরা পুস্তিকাটি সম্পাদনের জন্য আমাকে অনুরোধ জানালে আমি সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করি। কারণ তিনি আমার এক অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল তাঁর লিখনীতে আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার মত বেশ তথ্য বিদ্যমান থাকবে। পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করার পর আমার সে ধারণাটি সঠিক বলে প্রমাণিত হলো।

পুস্তিকাটি রচনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যতটুকু আঁচ করতে পারলাম তা হলো, বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নিজেদেরকে যে মনে করে বসেছে, তারা যেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা মনে করছে যে এ বিশ্বের অস্তিত্ব হচ্ছে এক নিরেট দুর্ঘটনা (were accident), যার পেছনে কোন স্রষ্টার হাত নেই। ডারউইনের তথাকথিত বিবর্তনবাদ তথ্যের (so called evolution theory) প্রভাবে এ প্রজন্মের অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে মানুষ তার সৃষ্টির সূচনাতে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজপ্রাণী ছিল, যা হাজার হাজার স্তর পেরিয়ে লেজবিশিষ্ট বানরের (ape) রূপ পরিগ্রহ করে, অতঃপর সে স্তর থেকে পুনরায় বিবর্তনের মাধ্যমে লেজবিহীন মানবে পরিণত হয়। লেখক জোরালো যুক্তির মাধ্যমে এসব ধারণাকে ভ্রান্ত এবং দাবীকে খণ্ডন করার সফল প্রয়াস পান। পক্ষান্তরে, তিনি মানব সৃষ্টির প্রকৃত বাস্তবতাকে তুলে ধরে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে মানুষ

হচ্ছে আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য চলার পথ চিহ্নিত করে দেন। এ পথের অনুসরণেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। আধুনিক বিজ্ঞানের চোরাগলিতে পা বাড়িয়ে অন্ধকারে হাতড়ানোর মধ্যে মানুষের জন্য কোন কল্যাণ নেই।

লেখক তাঁর এ পুস্তিকাটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য একটি শিরোনাম উল্লেখ করেন। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে: 'মানবজাতির জ্ঞান ও শক্তির মান।' এ অধ্যায়ে তিনি বিশ্বজগৎ তথা সৌরজগৎ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররাজী ও মহাশূণ্যের তুলনায় মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের মানবিক স্বত্ত্বার মূল্যায়নের আহ্বান জানান, যাতে করে এ কথা স্পষ্ট হয় যে বিশাল সৃষ্টিজগতের তুলনায় পৃথিবীর অবস্থান একটি অণুর মত, আর মানুষের অবস্থানকে তো পরমাণুর সাথেও তুলনা করা যায় না। কাজেই মানুষের যেমন দৈহিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তদ্রুপ রয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধিরও সীমাবদ্ধতা। অতএব মানুষের জন্য সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী হতে পারে? এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা নিজেই বিশ্বসৃষ্টি ও মানব জাতির সূচনা সম্পর্কে যা ব্যক্ত করেছেন তাই চূড়ান্ত সত্য এবং তাতে বিশ্বাস করা ছাড়া মানুষের জন্য আর বিকল্প কোন পথ নেই।

লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, 'যুগে যুগে প্রেরিত মানুষ'। এ অধ্যায়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষ যখন মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, আর স্রষ্টার দেয়া তথ্যে বিশ্বাস করবে তখন দেখতে পাবে যে মানুষের জন্য আসল করণীয় হচ্ছে নিজের সীমিত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম জ্ঞানের উপর নির্ভরতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ ঘোষণার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। আল্লাহর তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে তিনি যুগে যুগে মানব সন্তানদের মধ্য হতেই কিছু লোককে বাছাই করে তাদের মাধ্যমে মানুষকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের তথ্য এবং সঠিক পথের দিশা দান করেন। যুগে যুগে এঁরা নবী ও রসূল (আঃ) হিসেবে পরিচিত। এ ধারাবাহিকতায় মানবেতিহাসের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে তিনি একজনকে চূড়ান্ত রসূল (সাঃ) ও সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। যিনি পুরোপুরি ঐতিহাসিক যুগে এবং দ্বিপ্রহরের মত এক আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে তাঁর জীবনকাল অতিবাহিত করেন। যাঁর মুখনিসৃত প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি মন্তব্য, আদেশ-নিষেধ-অনুমোদন, পছন্দ-অপছন্দ এমনকি ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি মানবজাতির উদ্দেশ্যে এমন একটি অমোঘ জীবনবিধান দিয়ে যান যা স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে বিশ্বের যে কোন অঞ্চল সমাজ, জনগোষ্ঠী ও সময়কালের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি যে ধর্মগ্রন্থটি প্রাপ্ত হন তা সকল প্রকার পরিবর্ধন, পরিবর্তন, সংযুক্তি ও বিয়োগ কর্ম বা বিলুপ্তি জাতীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত এবং এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ, বাক্য এমনকি প্রতিটি যতিচিহ্ন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থেকে মূল পাঠের অনুরূপ (in vervatim form) বিদ্যমান।

এমনটি পূর্ববর্তী আর কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়নি। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আর কোন নবী-রসূলের (আঃ) জীবনালেখ্যও নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়নি।

আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবন বিধানের আলোকে চূড়ান্ত রসূল (সাঃ) অন্ধকারে নিমজ্জিত ও বিশ্বের বুকে আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে তাওহীদে বিশ্বাসী, উন্নত চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ-চরিত্রের অধিকারীদের সমন্বয়ে বিশ্বের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সৃষ্টিকারী 'মুসলিম উম্মাহ' নামের একট জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যান, যারা মানবেতিহাসের সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী এবং সোনালী যুগের মানুষ বলে চিহ্নিত হন। এ অধ্যায়ে লেখক এ কথাটি প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে চূড়ান্ত রসূল মহানবী (সাঃ) এর প্রদর্শিত জীবন বিধানই একমাত্র যথার্থ ও অনুসরণযোগ্য জীবন বিধান এবং মুসলিম উম্মাহ নামক জনগোষ্ঠীই এ বিধানের একমাত্র অনুসারী। এ বিধানকে বাদ দিয়ে আর কোন জীবন বিধানের মধ্যে মানব জাতির কল্যাণ নেই।

অতএব, যারা এ আদর্শকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ ও পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে তারা মূলত: মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কোন বুদ্ধিমানের উচিৎ নয় এ সব পথ ও মতের অনুসরণ করা।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে: 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন মতবাদ'। এ অধ্যায়ে লেখক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, যারা স্রষ্টাতে বিশ্বাসী নয় ও তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ইন্দ্রিয়বাদ ও জড়বাদের ধুয়া তুলছে তাদের দাবী সম্পূর্ণই অসার ও অবাস্তব। অনুরূপভাবে যারা সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের দিকে মানুষকে আহবান করছে তারা মানুষের জন্য কোন কল্যাণবার্তা দিতে পারেনি বা তাদের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করতে পারেনি। বরং যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে তারা মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা পর্যন্ত হরণ করেছে।

চতুর্থ এবং সর্বশেষ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে: 'শেষ কথা ও প্রত্যাবর্তন'। এ অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ কথাই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, আল্লাহতে বিশ্বাস এবং নবীজির (সাঃ) আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত মানব জাতির জন্য আর কোন মুক্তিপথ খোলা নেই। আধুনিক সমাজব্যবস্থা মানুষকে কিছু প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা দিলেও তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের সর্বনিম্নে পৌঁছিয়ে দেয়ার পথ সুগম করেছে।

অতএব, সকল তন্ত্র-মন্ত্র বাদ দিয়ে একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।

(প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক)
২১.০৮.২০২১

সূচীপত্র

এক. মানবজাতির জ্ঞান ও শক্তির মান / ১-৭
বিশাল সৃষ্টি জগতের তুলনায় মানুষের অবস্থান / ১
মানবিক সীমাবদ্ধতা /২
দৈহিক সীমাবদ্ধতা /৩
জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা /৩

দুই. যুগে যুগে প্রেরিত মানব / ৮-১৭
পথ প্রদর্শক /৮
শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী /১০
শেষ নবীর স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাৎপর্য /১১
ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগ /১৩
বিশ্বনবীর আহ্বান /১৫
বিশ্বাস, মতবাদ ও বিবিধতত্ত্ব /১৫
সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বিবর্তনবাদ /১৬

তিন. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন মতবাদ / ১৮-৪২
সৃষ্টির বিস্ময় /১৮
ডারইউন তত্ত্ব /২৩
সমাজতন্ত্র ও ইসলাম /২৮
সমাজতন্ত্রের অসারতা /৩২
সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সম্পদের সুষম বন্টন /৩৬
বহুঈশ্বরবাদ ও বিবিধ ধর্মীয় তত্ত্ব /৩৮

চার. শেষ কথা ও প্রত্যাবর্তন / ৪৩-৫৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আরম্ভ করছি পুনর্জীবনদাতা এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

এক.
মানব জাতির জ্ঞান ও শক্তির মান

বিশাল সৃষ্টি জগতের তুলনায় মানুষের অবস্থান

মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি তথা মানবিক শক্তি ও দৈহিক সামর্থ মূল্যায়নের পূর্বে বিশ্বজগত তথা নক্ষত্র, সৌরজগত এক কথায় সারা মহাশূন্যের সম্মুখে মানবিক সত্ত্বার মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। জ্ঞানী-গুণীদের ধারণা, আমাদের এ ভূ-মণ্ডল মহাশূন্যের তুলনায় আকৃতির দিক দিয়ে একটি ধূলি কণার চাইতেও ক্ষুদ্রতর। এ উদাহরণ হতে এর সম্যক ধারণা করুন যে, পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে যদি ৪.২৪ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হয়, তা হলে তারকা জগতের দূরত্ব ও আকৃতিটা একটু অনুধাবন করুন। আরো এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে যাদের আলো আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারেনি। তাহলে এক নজরে মহাশূন্যের পরিধি সে তারকাগুলির আকারের তুলনায় পৃথিবীর আকারটি একবার তুলনা করে দেখুন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের মুহূর্তেও কি কেউ দাবি করতে পারবে যে মহাশূন্যের সমস্ত রহস্য উদঘাটিত হয়েছে? তারকা জগতের পরে কোন জগত বিরাজমান তা কোন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছে কি? সৌরজগৎ একটি না বহু সে সমস্যার কোন সমাধান হয়েছে কি? তাহলে এটি সহজেই অনুমেয় যে, পৃথিবীর

অস্তিত্ব মহাশূন্যের তুলনায় একটি অণুর চাইতে বড় কিছু নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশে মানুষ নামক এক-জাতীয় প্রাণীর গুরুত্ব এবং এর বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি সামর্থের মান কতটুকু তা একবার আমাদের যাচাই করে দেখা উচিৎ।

মানবিক সীমাবদ্ধতা

প্রথমে মানুষের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বুদ্ধি অথবা Intelligence একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। এর অধীনে চাতুর্য (Cleverness), অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এখন আমরা একজন লোককে কোন অর্থে বুদ্ধিমান বলে গণ্য করব? প্রত্যেক জ্ঞানীই কি বুদ্ধিমান? অভিজ্ঞতা ছাড়া কি বুদ্ধিমান হওয়া যায় না? প্রজ্ঞা কি সর্ব বিষয়ে লাভ করা সম্ভব? ধূর্ততা ও শঠতাকে আমরা কোন পর্যায়ে ফেলব? সকল দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিক কি বৈষয়িক ব্যাপারে সুচতুর ব্যক্তি? একজন রাজনীতিবিদের কি কিছুটা বৈষয়িক বুদ্ধি ছাড়া সর্ববিষয়ে জ্ঞান থাকতে পারে (তথা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিষয়, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি)? এক কথায় মানুষ বুদ্ধির জোরে কোন না কোন দুই বা এক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী হতে পারে, সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ হওয়া অসম্ভবই নয় বরং প্রকৃতি বিরুদ্ধও। কারণ, মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি এবং রুচির মধ্যে ঐক্যের চাইতে অনৈক্যই বেশি দৃষ্ট হয়। যেমন, কোন কোন অঞ্চলের মানুষ গড়পড়তা লম্বা, কোথাও বেঁটে, আবার কোথাও মোটা, অন্যত্র পাতলা গড়নের। এছাড়া বর্ণ ও ভাষার দিক দিয়ে বিভিন্নতা রয়েছেই। একই গোত্রীয় মানুষের মধ্যেও রুচি, চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতা নিয়ে কতই যে পার্থক্য রয়েছে তার হিসাব করা অসম্ভব। সুতরাং এ বিচিত্র সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী মানবজাতির মানসিক সত্ত্বার মধ্যেও যে বৈচিত্র্য থাকবে এতে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

সুতরাং এ পার্থিব জীবনে মানবিক সমস্যাদির সমাধানকল্পে আমরা কার বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারলে একটি সুখি এবং সমৃদ্ধশালী জগত গড়ে তুলতে পারব? প্রকৌশলী? রাজনীতিবিদ? বৈজ্ঞানিক? দার্শনিক? সাহিত্যিক? ডাক্তার? অর্থনীতিবিদ? সৈনিক? কেউই তো নিজ অক্ষের বাইরে বিশেষজ্ঞ নন এবং এককভাবে সব সমস্যার সমাধান তো কল্পনাতীত ব্যাপার। ধরা যাক সবার বুদ্ধিকে যৌথভাবে কাজে লাগিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে। তখন উঠবে নেতৃত্বের প্রশ্ন, মতবাদ অথবা পেশাগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত দুই

নৌকায় পা দেওয়ার পরিণতি অনুধাবন পূর্বক বহু নৌকায় পা-দানে রসাতলে গমন। মানবীয় সমস্যার সঠিক সমাধান মানবীয় বুদ্ধি ও জ্ঞানের আওতার যে বাইরে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ছাড়া মানুষের বুদ্ধির দৌড় কতটুকু হতে পারে এবং তার শক্তি সামর্থও বা কতটুকু নিম্নলিখিত পর্যায়ে তা নিরূপণ করা যেতে পারে।

দৈহিক সীমাবদ্ধতা

প্রথমতঃ মানুষের শারীরিক শক্তি ও বয়সের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। মানুষ বেশির মধ্যে ১০০ বছর কিংবা তার চাইতে কিছু বেশি বয়স পেতে পারে এবং এর চাইতে বেশি বাঁচবার যোগ্যতা তার শরীরের নাই। কারণ তার শরীরের কাঠামো সীমাবদ্ধ বয়সের অনুযায়ী গঠিত। তার চোখ, কান, দাঁত, পাকস্থলী, চামড়া তথা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শেষ বয়সে অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং সে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দীর্ঘায়ু অথবা অমরত্ব লাভ করবার চেষ্টাও করে তাহলে হৃদপিণ্ড থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি অঙ্গ কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্তন করে নিতে হবে। যেহেতু তার শারীরিক যন্ত্র মোটর গাড়ির মত বিশেষ সীমিত সময়োপযোগী করে নির্মিত, সুতরাং এর পরিণতি হবে পুরানা লক্কড় মোটর গাড়ির মতই; যার নির্মাতার ছাপখানা পর্যন্ত পরিবর্তিত। সুতরাং এ হিসাবে তার বেঁচে থাকাই আসল সার্থকতা। দ্বিতীয়তঃ নিজস্ব শরীরের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানুষ একেবারেই অসহায়। নিজের জন্মের উপর তার কোন ক্ষমতা নাই, ইচ্ছাপূর্বক সে জন্মের সময়ও বংশ নির্বাচন করতে পারে না। সে ইচ্ছাপূর্বক শিশু থাকতে পারে না, জোরপূর্বক যৌবনকে ধরে রাখতে পারে না। বার্ধক্য, জ্বরা এবং রোগ-শোককে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে শেষ পরিণতির দিকে পদচারণা করতে হয়।

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

সুতরাং যার নিজের শরীরের উপরই কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই সে কোন শক্তির বাহাদুরী করে! তৃতীয়তঃ মানুষের বুদ্ধির দৌড় নিয়ে আলোচনা করা যাক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মানব সমাজের সৃষ্টি ও সভ্যতার উৎকর্ষের ইতিহাস ১০/১২ হাজার বছরের চাইতে বেশি নয় এবং বর্তমান বিংশ শতাব্দিই হচ্ছে শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ এ ১০/১২ হাজার বৎসরের মধ্যে। এ হাজার হাজার বছরের পুরুষাণুক্রমিক চেষ্টায় মানুষ আগুনের ব্যবহার এবং ধাতব দ্রব্য আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে

আনবিক যুগে এসে পৌঁছে এবং গতি ও সময়কে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মানুষ এককালের কল্পনা অথবা অকল্পনীয় ব্যাপারকেও বাস্তবরূপ দান করতে সক্ষম হয়েছে। নিজস্ব পাখা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ আজ পৃথিবীর যে কোন দ্রুতগামী পাখির চাইতে দ্রুতগামী। আজ চাঁদ আর কল্পনার বস্তু নয়। কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ উপগ্রহের হাল হকিকত সম্মন্ধেও মানুষ ওয়াকিবহাল। সুতরাং হাজার হাজার বছরের চেষ্টার ফলে মানুষ আজ অন্তত নিকটতম উপগ্রহে গমন করতে সক্ষম হয়েছে।

ডানাবিহীন ধরার মানুষের জন্য এটি কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়, সত্য, কিন্তু যতটুকু বুদ্ধি ও জ্ঞানের সে দাবীদার; সে তুলনায় এটি কি খুব বড় কৃতিত্ব? দীর্ঘ ১০/১২ হাজার বছরের চেষ্টায় শুধু সে নিকটতম উপগ্রহে যেতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ তার নিজস্ব বাসা থেকে উড়ে নিকটতম বাসাটিতে যেতে সক্ষম হয়েছে যার দুরত্ব মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। তাহলে কোটি কোটি মাইল দুরের গ্রহগুলিতে যেতে আরও কত বছর লাগবে? নিকটতম তারকাটিতেও কি সে পৌঁছতে পারবে না অদুর ভবিষ্যতেও? যেখানে পৌঁছতে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতি সম্পন্ন যানের জন্যও চার বৎসর সময়ের দরকার। আরও দূরবর্তী নক্ষত্ররাজির রহস্য কখন উদ্‌ঘাটিত করবে? তাছাড়া নক্ষত্র স্তরের পরেও তো আরও কত কিছু থাকতে পারে। তা দুরে থাকুক, আমাদের সাধারণ বিচরণক্ষেত্র এ পৃথিবীর সব রহস্যও উদঘাটিত করা সম্ভব হয়েছে? এর দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছবার পরও সৃষ্টি রহস্যের কোটি ভাগের এক ভাগও উদঘাটন করতে পারি নাই। এই জ্ঞানের স্বল্পতাই আমাদের মত সীমিত বয়স, সীমিত শক্তি ও স্থান-কাল-পাত্রের অধিকারের জন্য স্বাভাবিক। পবিত্র কোরআনে অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছে যে,

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"
(বনী ইসরাঈল ১৭:৮৫)

মহাশূন্যের কথা বাদ দিলেও, এ পৃথিবীর যাবতীয় রহস্যও তো উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। যেমন অনেক রোগের এ পর্যন্ত কোন কার্যকর ঔষধ আবিস্কৃত হয়নি। ক্যান্সার, প্যারালাইসিস, বহুমুত্র ইত্যাদি এখনও দুরারোগ্য ব্যাধি।

এছাড়া সর্প-দংশন, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদির সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস এখনও অনাবিষ্কৃত। কথাটি আরও পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্য মহাশূন্যের একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করছি। যে সব তারকার আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি, সেগুলির কথা বাদ দিলেও যে তারকার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে অন্তত ২০০ বৎসর সময় লাগে, সেখানে পৌঁছাও কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? আলোর সমান গতিসম্পন্ন কোন নভোযানের পক্ষেও তো সেখানে পৌঁছতে ২০০ বৎসর সময় লাগবে। অথচ মানুষের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ১০০ কি সোয়া শ' বৎসর। সুতরাং মানুষের পক্ষে সমস্ত সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন কোনদিনই সম্ভব হবে না।

অতএব, যে মানবজাতির জ্ঞানের পরিধি এত সংকীর্ণ, শারীরিক কার্যক্ষমতা এতই সীমিত, সে মানবজাতি কীসের বলে এবং কোন যুক্তির বলে বিশ্ব নিয়ন্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে? অথচ, বিশ্বরহস্য যদি একটি মহাসাগর হয় তার এক বিন্দু পরিমান জ্ঞানও মানুষ অর্জন করতে পারেনি। তবে স্রষ্টাকে অস্বীকার করবার মত ধৃষ্টতা সে কোথা হতে লাভ করল?

আমার মনে হয় দু'ধরণের মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হতে পারে। প্রথমতঃ যারা অজ্ঞ, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রয়োজনীয়তা অথবা সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যারা কোনরূপ ধারণা করতে অক্ষম এবং কোন জ্ঞানের যুক্তিই যে অনুধাবন করতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ যারা খুব বেশি জ্ঞানী বলে নিজেদেরকে মনে করে এবং নিজস্ব যুক্তি-তর্ক সমূহকে যারা অকাট্য ও নির্ভুল বলে মনে করে। অথচ, তারা নিজস্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অপরিপক্ক ও অসম্পুর্ণ বলে মনে করলে এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হত না। কারণ, সীমিত জ্ঞান ও নেতিবাচক মনোভাবে বশীভূত হয়ে অসীমের সন্ধানে পাড়ি জমালে তার পরিণতি অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার মতই। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। কোন কিছুকে আবিষ্কার করার মানসে যদি কেউ সাধনায় লিপ্ত হয় তাহলে তার কাছে যুক্তি ও প্রমাণের অভাব থাকেনা, যদি সেটি ধরাছোঁয়ার বাইরে হয়, অদৃশ্য ও অনুভব লব্ধ হয়? স্রষ্টাকে তো কেউ দেখেন না। কেউ অস্বীকার করলেও তো তিনি নিজে এসে ধরা দেন না। কাজেই তাঁকে অস্বীকার করার বেলায় জ্ঞানী ও মূর্খের স্থান অভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। ব্যাস, অস্বীকার করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে গেল। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, তাকে অস্বীকার করার জন্য আবার কি যুক্তি প্রমাণের দরকার? এখানে সমস্ত ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব

আস্তিকের উপরই ন্যস্ত। তাকেই প্রমাণ করে দিতে হবে যে, স্রষ্টা ছিলেন, আছেন, অনাদিকাল পর্যন্ত থাকবেন। এমনি তো আস্তিক ও নাস্তিক উভয়ই তো সীমিত জ্ঞানের ধারক, কিন্তু আস্তিক যে অন্তর্দৃষ্টি সমৃদ্ধ মনোভাব নিয়ে অসীমের সন্ধানে বের হয় তা নাস্তিকের চাইতে ভিন্নতর। সৃষ্টি রহস্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় তার মনের মধ্যে নতুন নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং চিন্তার জগতে যতই এগিয়ে যাবে ততই সৃষ্টি রহস্যের নতুন দিগন্ত তার সামনে উন্মোচিত হবে। সে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি রহস্যের কোন কূল কিনারা করতে না পেরে নিজের অজ্ঞাতসারেই ডাক দিবে, হে প্রভু আমাকে পথ দেখাও আমি অন্ধ, আমাকে শক্তি দাও- আমি সহায় সম্বলহীন, আমাকে জ্ঞান দাও, আমি মূর্খ। তখন স্রষ্টা সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ ও মহিমায় ভাস্বর হয়ে এই অজ্ঞ ও মূর্খ মানব সমাজকে ভ্রান্তি ও ধ্বংস হতে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে আসেন এবং নিজস্ব মনোনীত শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানদের মারফৎ সঠিক পথের সন্ধান দেন। যে পথ একমাত্র স্রষ্টারই জানা। কেননা, মানুষ অতি সীমিত জ্ঞান ও স্বভাবজাত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে নিজস্ব পথ রচনা করতে সক্ষম নয়। কারণ, অন্ধ ও দ্রষ্টা কিছুতেই সমান হতে পারে না لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ আর মানুষ স্বভাবতই ভ্রান্ত ও অজ্ঞ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا স্রষ্টার বাণী পৌঁছবার পর তখনই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় মানুষের চিন্তার রাজ্যে। সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সত্যের পথে। তখন অন্তরের দৃঢ়তা আর চিন্তার গভীরতাই মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে। কারণ, কোন একটা নতুন ধারণা ও মতবাদকে গ্রহণ করা ও পুরাতন ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ করতে কঠিন মনোবলের প্রয়োজন হয়। এই চিন্তা সঠিক খাতে প্রবাহিত হতে পারে যখন অন্তরের জিজ্ঞাসা ও জাগ্রত বিবেকের সাথে কারও আকুল আহ্বান হুবহু মিলে যায় এবং এজন্য স্রষ্টার মনোনীত ও প্রেরিত পুরুষেরাই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। কারণ, তাঁদের পথ ও মত নিজস্ব খেয়াল খুশি এবং ধ্যান ধারণায় গঠিত নয় বরং তা স্রষ্টারই প্রদর্শিত পন্থা।

এ পথ সুশৃঙ্খল মহাজগত পরিচালনার মতই সুবিন্যস্ত। অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদি যেমন অনাদিকাল হতে সুশৃঙ্খলভাবে উদিত ও অস্তমিত হয়ে আসছে, নবীগণ (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথও সে রকম সুশৃঙ্খল এবং নির্ভুল। কারণ, ধর্মও অন্যান্য সৃষ্টির মত ফিৎরতের অংশবিশেষ।

(فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخلق الله) ফিৎরত অর্থ কি? স্বভাব? প্রকৃতি? কুদরত? Native? না কোন বিশেষ নিয়ম বা পন্থা? আমার মনে হয় শেষোক্ত অর্থটিই বেশি প্রযোজ্য। যারা জগতের ভার প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বসে রয়েছেন তারা প্রকৃতির কোন সঠিক সংজ্ঞা দিয়েছে কি? যদি দিয়ে থাকে তাহলে এর পরবর্তী পর্যায়টিকে নিয়ে কেন চিন্তা করে না? প্রকৃতির অর্থ যদি স্বভাব নিয়ম অথবা কোন বিশেষ পন্থা অথবা শৃঙ্খলা হয়ে থাকে আর সে মোতাবেক যদি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-ষড়ঋতুর বিবর্তন এবং মহা পরিক্রমণ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হতে থাকে, তাহলে সে নিয়ম বা পন্থাটির (প্রকৃতির) রূপরেখা কে প্রণয়ন করেছেন? এর নিয়ন্তা কে? অথবা, কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? মোটকথা যাদের জ্ঞান এখনও সৌরজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা নিছক অনুমান ছাড়া আর কী যুক্তি দিতে পারে?

দুই.
যুগে যুগে প্রেরিত মানব

পথ প্রদর্শক

মনে করুন, একজন লোক যে কোনদিন বৈদ্যুতিক পাখা অথবা বাতি দেখেনি এবং এ সম্বন্ধে কারও কাছে কিছু শুনেও নি, সে যদি হঠাৎ কোন জায়গায় উক্ত পাখা ও বাতিকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ও জ্বলতে দেখে তাহলে তার মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে? সে কী করে অনুমান করবে এটি কীসের শক্তিতে চলে? কী করে বুঝবে এটি কখন ও কীভাবে ঘুরতে আরম্ভ করেছে এবং কখন থামবে? হয়তো সে এও মনে করতে পারে এগুলো এইভাবেই চলে, এদের কেউ চালিয়ে অথবা জ্বালিয়েও দেয় নি এবং এগুলো কোন দিন থামবে না, এগুলো এমনিই চলে, এর পেছনে কোন শক্তিরও দরকার হয়না। জড়বাদীর অনুমান ও এ ব্যক্তির অনুমানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? হ্যাঁ, এ সময় যদি আর একজন লোক উপস্থিত হয়ে উক্ত রহস্য পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির ভ্রান্তি দূর হতে পারে এবং তদ্রুপ হচ্ছে নবীগণের (আঃ) ভূমিকা। অবশ্য সংশয় নাও কাটতে পারে যদি সুইচ খোলা এবং বন্ধ করার ক্ষমতা তারও না থাকে এবং হাতেনাতে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম না হন।

যুগে যুগে প্রেরিত মানব

বিশ্বলোক পরিচালনা করার ক্ষমতা নবীগণের (আঃ) নাই, তাঁরা শুধু বার্তাবাহক মাত্র। সে বার্তায় আস্থা রাখা না রাখার দায়িত্ব জনগণের। বিবেক সম্পন্ন জনগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক বিশ্বাস স্থাপন করেন। যারা স্বার্থপর, চোখ থেকেও অন্ধ তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে। অথচ, তারা বুঝে না যে, স্রষ্টা তাদের আনুগত্য ও এবাদতের মুখাপেক্ষী নন। যাঁর যাবতীয় সৃষ্টির তুলনায় পৃথিবী অণু পরমাণুর চাইতেও ক্ষুদ্রতর এবং তথাকার মানুষের কলেবর শূন্যের কাছাকাছি তারা তাঁকে না মানলেই- বা কী এসে যায়? অবশ্য যে কারও আনুগত্যে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সন্তুষ্ট হন, এটি তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধিদান পূর্বক মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে যেহেতু তিনি সৃষ্টি করেছেন সেজন্য মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দয়া রয়েছে। তাদের উচিৎ ছিল অন্তত মহাজগতের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও অনন্ত মহাসৃষ্টি দৃষ্টে তাঁকে স্বীকার করে নেয়া, অন্তত বিবেকের তাড়নায় হলেও। কিন্তু, স্রষ্টাতো আর তাদের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। বিপথগামি ছেলে-মেয়ে যতই মন্দ হোক না কেন, মাতা-পিতা তাদের মঙ্গল কামনা না করে পারেন না। তদানুরূপ স্রষ্টাও মানুষের হিতার্থে যুগে যুগে বার্তাবাহকদের মারফৎ তাঁর বাণী প্রেরণ করে থাকেন। বার্তাবাহক বা নবীগণের (আঃ) জীবনীই তো স্রষ্টার অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাঁদের সবাই ছিলেন সত্যবাদী, সৎ চরিত্রবান মেধাবী, বুদ্ধিমান, সুপুরুষ, জ্ঞানী, সদবংশজাত, অসীম ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার মূর্তপ্রতীক, দাতা, দয়ালু, ন্যায় নিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ, মিষ্টভাষী, বিনয়ী, হিংসা-দ্বেষ লোভ লালসার অনেক উর্দ্ধে, অর্থাৎ যাবতীয় মানবিক গুণাবলীর আধার। রক্ত মাংসের মানুষ হলেও তাঁরা ছিলেন মহাপুরুষ, মহামানব। এক কথায় যাঁরা জীবনের সর্বস্তরে সততা ও সত্যবাদিতার নজির স্থাপন করে গিয়েছেন, তাঁরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও বাণীপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মিথ্যা বার্তা পরিবেশনের কী কোন কারণ থাকতে পারে? আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক নবীরই (আঃ) মিশন ছিল একই, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং একত্ববাদের প্রচার। তাঁরা কোন মানুষের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন নি এবং অনেকেই বাল্যকালে ছাগল ভেড়া চড়াতেন এবং মুক্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা সবাই ছিলেন সংসারি পুরুষ, কর্মঠ এবং বিবাহিত। নিজ রোজগারে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং কারও টাকা পয়সার ধার ধারতেন না। আরও প্রণিধানযোগ্য এই যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত তাঁদের কারও সাথে শত্রুতা ছিল না। সমস্ত শত্রুতার মূলে ছিল আল্লাহর বাণী প্রচার। তাঁরা শুধু বাণী প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ

সংগ্রাম করে গেছেন। পর্বতপ্রমাণ সংকটের মোকাবেলা করেছেন বিনা দ্বিধায়। এমনকি সত্য প্রচার করতে গিয়ে শত শত নবী (আঃ) শাহাদাৎ বরণ পর্যন্ত করেছেন।

সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী

আমাদের দেশে পয়গাম্বরী আহ্ওয়াল (সংকট) একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত সর্ব-প্রধান দায়িত্ব হল নবুওয়াত। সুতরাং যিনি এত বড় দায়িত্ব বহন করবেন তাঁকে যে সর্বগুণে গুণান্বিত হতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে সেটাই প্রশ্ন। উপরোল্লিখিত গুণাবলী যাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ নবী। যাঁর ধর্ম যত বেশি কার্যকরী বলে প্রমাণিত তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব শ্রেষ্ঠ কিতাব ও তাঁর দায়িত্ব হবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠোরতম। তাঁর দাওয়াত হবে স্থান কাল পাত্রের উর্ধ্বে সারা বিশ্বব্যাপী। তিনিই হবেন সর্বশেষ নবী, কারণ তাঁর পরেও যদি নবীর প্রয়োজন হয় তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তাঁর ধর্মই হতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ধর্ম। কারণ, এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। সে ধর্মে থাকতে হবে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আপামর মানবসমাজের সব সমস্যার সমাধান এবং তা হতে হবে সর্বকালের সর্বদেশের যুগোপযোগী। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব হবে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এবং তাতে থাকতে হবে ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। তাঁর আবির্ভাবের পরে অন্য কোন নবী, ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নেই, থাকতে পারে না, কারণ তাঁর প্রদর্শিত মত ও পথ যদি সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে অন্য পথপ্রদর্শকের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতগণ অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায়ের আর একজন নবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, এ তো কল্পনারও বাইরে এবং এর প্রয়োজনীয়তাই–বা কী?

মানবজাতির সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে হাজার হাজার ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সম্রাট, শিল্পী ও সেনাপতির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের নাম করা যেতে পারে কী, যাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাঁর প্রত্যেকটি আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত, যাঁর ঐশীবাণী সম্বলিত ধর্মগ্রন্থ আজও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান, যাঁর অনুসৃত ধর্মকর্ম সহস্রাধিক বৎসর পরও সম্পূর্ণ সজীব ও

অবিকৃত এবং কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক অতি নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। একমাত্র যাঁকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলা শাখা-প্রশাখায় ষোলকলায় পরিপূর্ণ অবস্থায় সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। যিনি ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রনায়ক, সমরনায়ক, সমাজ সংস্কারক, আইনদাতা, মহান নেতা, দরদী পিতা, আদর্শ স্বামী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী, এবং অতি সৎ প্রতিবেশী। যিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রের রচয়িতা এবং বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। যিনি হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যাঁর জীবনের উপর লিখিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা সর্বাধিক। যাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, ক্ষয়িষ্ণু নয় এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। যিনি ছিলেন দরিদ্র অনাথ সহায়সম্বলহীনদের আশ্রয়, কৃতদাসদের মুক্তিদাতা, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার জলন্ত উদাহরণ। সে মহামানবের নাম আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনিই হচ্ছেন শান্তির বার্তাবাহক মহামহিমান্বিত মোহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। তাঁর আবির্ভাব আরব ভূমিতে হওয়ার তাৎপর্যও অপরিসীম।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে শেষ নবীর তাৎপর্য

আরব হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার লীলাক্ষেত্র সমূহের মধ্যস্থলেই অবস্থিত। এর একদিকে প্রাচীনতম সভ্যতার সাক্ষর মিশর, অপরদিকে ইলাম, ফিনিশিয়, ক্যালডিয়, হিব্রু, ব্যাবিলনীয় ও পারস্য সভ্যতার লীলাভূমি ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি অবস্থিত। এছাড়া সামান্য পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে প্রাচীন কার্নেজ, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার দেশসমূহ অবস্থিত এবং লোহিত সাগরের অপর পারে অবস্থিত প্রাচীন সভ্যতার দেশ আবিসিনিয়া। সুতরাং দেখা যায় যে, আরবের ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল কেন্দ্র-বিন্দুর মত। প্যালেস্টাইন বিজয়ী হিব্রুরা মিশর বিজয়ী হাইকসস (Hyksos) এবং সিরিয়া বিজয়ী হিব্রুরা সব আরবের বাসিন্দা। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গমস্থল ছিল এই আরব ভূখণ্ড। কাজেই বিশ্বনবীর আবির্ভাব এমন স্থানে হতে হবে যেখান হতে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর মতবাদ অতি সহজেই ছড়িয়ে যেতে পারে। একমাত্র ভৌগলিক অবস্থানের জন্যই ভারতীয় এবং চৈনিক ধর্মসমূহ বিশেষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ইউরোপ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।

পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ এমন এক ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকতে হবে যা চিরদিন কথিত ও লিখিতরূপে প্রচলিত থাকবে। প্রাচীন ধর্মীয় ভাষাসমূহ যেমন সংস্কৃত, পালি, হিব্রু, সিরিয়াক ইত্যাদি এখন আর কোন জাতির মুখের ভাষা নয়। ল্যাটিন ভাষার প্রচলন আজ আর কোথায়ও নেই। এসব ভাষা এখন মৃত ভাষা বলেই পরিচিত। অথচ কোরানের ভাষা এখনও ২০টি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ভাষা। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমগণ কর্তৃক লালিত পালিত ও সংরক্ষিত ভাষা। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত মুষ্টিমেয় আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী অন্যতম। বিগত ১৫০০/২০০০ বৎসর এর মধ্যে পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নাই যা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় নি, একমাত্র আরবী ভাষা ব্যতিত। সুতরাং এমন এক সজীব ভাষায় সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ না হলে আর কোন ভাষায় হবে?

খৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত একমাত্র আরবী ভাষায় যতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তা হয়নি। এটি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী ও বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। এর ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত এবং শত শত প্রতি-শব্দ সম্বলিত পদসমূহ এর উন্নত মানের পরিচায়ক। ক্রিয়ার শ্রেণীবিন্যাস এবং বৈশিষ্ট্য প্রকরণের নিমিত্তে যে Bab system প্রবর্তন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন ভাষার ব্যাকরণে নাই। এ ছাড়া আরবজাতি ছিল তখনকার দিনে পৃথিবীর বর্বরতম জাতিগুলির অন্যতম। সুতরাং যে ধর্ম এহেন একটি জাতির চরিত্রে সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হবে তা অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে খুব সহজেই প্রসার লাভ করতে পারবে। শত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আরবজাতির মধ্যে এমন কতগুলো গুণ ছিল যা বিশ্বজনীন ধর্মের প্রসারের জন্য সহায়ক ছিল। তারা ছিল সাহসী যোদ্ধা, সংকল্পে অটল এবং দলীয় নেতার প্রতি অনুগত, স্বাধীনতা প্রিয়, সাহিত্যানুরাগী এবং অধিকাংশ এলাকা ছিল রাজতন্ত্র বর্জিত। এসব গুণাবলী একটি বিরাট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনে এবং আদর্শ ও সংস্কৃতি বিস্তারে বিশেষ সহায়ক ছিল। এ কারণেই মূল আরব ভূখণ্ড হতে উদ্ভুত ধর্মের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, প্যালেস্টাইন হতে উদ্ভুত ইহুদি ধর্ম ও খৃস্টান ধর্মের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

ইসলামের মাত্র ৫০০ বছর আগের খৃস্ট ধর্ম এবং সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেকার ইয়াহুদী ধর্ম মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যে কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোনরূপ

অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এমন কি, নিকটতম প্রতিবেশী আরবজাতির জীবনেও কি ধর্মীয়, কি রাজনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক কোন ক্ষেত্রে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। অথচ, মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই ইসলাম এমন সব অঞ্চলে প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয় যেখানে এর পূর্বে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অন্য কোন ধর্মের নামও লোকেরা শুনেনি। মোঙ্গল আক্রমণ, ক্রুসেড, ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং মুসলিম জাতির আদর্শ বিমুখতা ইত্যাদি কারণ সমূহই ইসলাম প্রচারের গতিধারা বার বার রুদ্ধ করেছে। নতুবা এটি লোক সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ১ম স্থানীয় ধর্মে পরিণত হতে পারত। বিশ্বনবীর (দ.) কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করবারও তাৎপর্য রয়েছে। জাত্যাভিমান, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, হীনমন্যতা যেহেতু মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি, সেজন্য নেতৃত্বের প্রশ্নে বংশগত মর্যাদার একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে বৈকি? মানুষ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের লোকের নেতৃত্বকে যত সহজে গ্রহণ করতে পারে, একটি সাধারণ অজ্ঞাত অখ্যাত বংশের লোকের নেতৃত্বকে অত তাড়াতাড়ি আমল দেয় না। মানে, সম্মানে, খ্যাতিতে এবং আভিজাত্যে কোরাইশ বংশ ছিল আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা ছিলেন আরবের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান কাবাগৃহের পুরোহিত এবং মহানবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর সাক্ষাৎ বংশধর। এছাড়াও শৌর্যে-বীর্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, জ্ঞানে-গুণে তাঁরা ছিলেন আরবের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং এ রকম একটি বংশে জন্মগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং, অন্যান্য আরব উপজাতির পক্ষে তাঁর নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবোধ করার কারণ ছিল না। বিশ্ব নবীর (আঃ) আবির্ভাব সময়োপযোগী ছিল। তাঁর জন্মলগ্নে বিশ্বময় যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধর্ম বিমুখতা, অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগ

প্যালেস্টাইনের হিব্রু জাতির মধ্যে শত শত নবীর (আঃ) আবির্ভাবের পরও মধ্যপ্রাচ্যে একেশ্বরবাদ কায়েম হয়নি, আরবের শিশুদের জীবন্ত গোরস্থ করা বন্ধ হয়নি, ইরানের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়নি। এরা শিক্ষা, সংস্কৃতি বা দর্শন কোন ক্ষেত্রে সামান্যতম অবদানও রাখতে পারেনি। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আলো নির্বাপিতপ্রায়, নারী ও কৃতদাসদের অবস্থা ছিল শোচনীয়, চারিদিকে অবাধ শোষণ ও উৎপীড়নের খেলা চলছিল। সমগ্র ইউরোপ ও আফ্রিকার অবস্থাও তথৈবচ।

অপরদিকে তখন ভারতের অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয় এবং হৃদয় বিদারক। বুদ্ধ ও মহাবীরের বাণী সাময়িকভাবে আলো বিতরণ করার পর চিরদিনের জন্য নিভে গেল। অবলা, সহায়-সম্বলহীনা যুবতী বিধবা নারীদেরকে সতীদাহের নামে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হতো। এবং এ নজিরবিহীন বর্বরতাকে নিয়ে তারা কতই- না গর্ব করত এবং এখনও করে। তারা বলে, তাদের মা বোনেরা হেসে হেসে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করত। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য শিশু সন্তানদেরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হত এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলী দেয়া হত, আরবদের মত শিশুদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হত। পুরাণ, গীতা, সংহিতার অপব্যাখ্যার দ্বারা স্বার্থান্বেষী ও অর্থলোভী পুরোহিতরা দেদার পয়সা রোজগার করত এবং ধর্মকে যাবতীয় কুসংস্কারের একটি পুটলিতে পরিণত করল। মহাকাব্যকে ধর্মপুস্তকে পরিণত করল। বর্ণাশ্রমের কথা আর নাই– বা লিখলাম, কারণ এ সম্বন্ধে বর্তমানে তারা নিজেই সমালোচনায় মুখর। বেদ পুরাণের নিরাকার ব্রাহ্ম ও একেশ্বরবাদ পুরোহিতদের বদৌলতে বহু আকার বিশিষ্ট (Anthropomorphistic) ৩৩ কোটিশ্বরবাদে পরিণত হল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও ভারত বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সহস্রাধিক বছরের মধ্যে বাল্মিকী, ব্রহ্মগুপ্ত, কৌটিল্য কিংবা কালিদাসের মত কোন মহামনীষীর জন্ম হল না। তখন ভারতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন কাব্যময়। যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ নিস্তব্ধ প্রায়। শঙ্কর আচার্য ও তার অনুচরগণ কর্তৃক এক নৃশংস উপায়ে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাত করা হয়।

কথিত আছে যে, প্রায় ৮০,০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মস্তক ঢেঁকির সাহায্যে চূর্ণ করে হত্যা করা হয়। অপরদিকে চীনের অবস্থাও ছিল তদানুরূপ। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম শুধু বুদ্ধের মূর্তি আর ভিক্ষুদের গেরু বস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চতুর্দিকে হিংসা, যুদ্ধ, হানাহানি দৃষ্টে বুদ্ধের বাণী নীরবে কাঁদছিল। টাও, সিন্টু, লাওসে, কনফুসিয়াস ইত্যাদি মহামনীষীদের প্রচারিত ধর্ম ও মতবাদ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে কতগুলি কিম্ভুতকিমাকার ধর্মীয় ও সামাজিক আচারে পরিণত হয়েছিল। এক সময় যে জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুরোধা হিসাবে পরিগণিত হত, তা আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের মূর্খতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। জুরাস্ত্রুর একেশ্বরবাদ লুপ্ত হয়ে তদস্থলে ইরানে অগ্নিপূজার প্রচলন হল। খৃস্টান ও ইহুদি ধর্ম পুরোহিতদের লোভ-লালসা ও জাল-জালিয়াতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। ঐশী বাণীসমূহকে নিজের খেয়াল খুশি মত অপব্যাখ্যা দ্বারা দেদার পয়সা রোজগার

করতঃ (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثمنا قليلا) এবং একেশ্বরবাদের আদর্শকে চরমভাবে ধ্বংস করল। ইহুদিরা ওযায়ের (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র এবং খৃস্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ) কেও তদানুরূপ ঘোষণাপূর্বক তাঁদের মূর্তিরূপে পূজা করতে আরম্ভ করল। অদৃষ্টের পরিহাস, একেশ্বরবাদের প্রচলন ও প্রতিমা পূজার উৎখাত সাধনকল্পে যে সব মহা-নবীদের (আঃ) আবির্ভাব হয়েছিল স্বয়ং তাদের অনুসারীরাই তাদেরকে আল্লাহর অংশীদারে পরিণত করল এবং তাঁদেরই মূর্তিকে ভক্তি সহকারে পূজা করতে আরম্ভ করল। সুতরাং, সারা বিশ্ব-ব্যাপী অরাজকতার চরম মুহূর্তে বিশ্বনবীর আবির্ভাব সময়ের তাগিদেই হয়েছিল।

বিশ্বনবীর আহবান

তাঁর দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল– আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা বার্তাবাহক। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের উপর। কারণ, মানব সৃষ্টির পরম লক্ষ্য হল স্রষ্টার দাসত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। অর্থাৎ স্রষ্টার নির্দেশে জীবন-যাপন করা। এ কারণে স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেওয়া একান্ত বাঞ্চনীয়।

বিশ্বাস, মতবাদ ও বিবিধতত্ত্ব

এ পর্যায়ে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **প্রথমত,** যারা জড়বাদী বা ইন্দ্রীয়বাদী, তারা ইন্দ্রীয় বহির্ভূত বলে স্রষ্টাকে স্বীকার করে না, **দ্বিতীয়ত,** যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়, **তৃতীয়ত,** যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী। আধুনিক যুগের নাস্তিকদের পরম গুরু হলেন দু'জন চিন্তাবিদ: ডারউইন ও কার্ল মার্কস। ডারউইন বিজ্ঞানের নামে নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করে মানবজাতির মূল সন্ধান করতে গিয়ে শুধু আধ্যাত্মিকতার মূলে কুঠারাঘাত করলেন না, বরং মানবজাতির মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করলেন। Origin of species বা প্রজাতির উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে ও Theory of Evolution, Survival of the Fittest (বিবর্তনের মাধ্যমে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনে উত্তরণ) ইত্যাদি দ্বারা তিনি বর্তমান জগতের যাবতীয় জীবজন্তুর আকৃতির মৌলিকতাকে অস্বীকার করে বসলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস, জড়বাদীরা ইন্দ্রীয় বহির্ভূত বলে স্রষ্টাকে স্বীকার করতে চায় না এবং এই ব্যাপারে কোন জ্ঞানীর যুক্তিকেই আমল দেয় না। অথচ, নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোটি কোটি বৎসর আগের ক্রমবিকাশকে

তারা নির্ভুল বলে বিশ্বাস করে, যার এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কারণ, মানবসমাজের ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই যে, কোন এক বিশেষ জীব অন্য জীবে পরিণত হয়েছে। তবে কি Evolution অজ্ঞানতা ও অসভ্য যুগেই প্রচলিত ছিল? মানবিক সভ্যতার উন্মেষের সাথে সাথে কি তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে? জৈবিক আকৃতি কি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে? ক্রম বিবর্তনের প্রয়োজন কি আপাততঃ বন্ধ হয়ে গিয়েছে? এ রকম হাজারো প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি ছাড়া এর কোন সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বিবর্তনবাদ

মানবিক সত্তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, জৈবিক (Biological) ও মনস্তাত্বিক (Psychological)। Physical বা শারীরিক সত্ত্বা আর মানসিক **সত্ত্বা এক হতে পারে** না। একজন ডাক্তার যে কোন লোকের সব ব্যবচ্ছেদ পূর্বক প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন এবং শারীরিক রোগও নির্ণয় করতে পারেন, অর্থাৎ তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন, কিন্তু লোকটি সুখী কি দুঃখী, সৎ কি অসৎ, মূর্খ কি জ্ঞানী, কোন ধর্মাবলম্বী, আচার ব্যবহার ভাল কি মন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা অসম্ভব। সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য জীবজন্তুর উপর শারীরিক সৌন্দর্য্য বা শক্তি দ্বারা নয় বরং মানসিক সত্তা বা বুদ্ধিমত্তা দ্বারাই। এখন প্রশ্ন হল, উত্তরাধিকাররের মূলসূত্র কি শুধু শারীরিক কাঠামো, নাকি বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক কাঠামো দু'টাই। নিশ্চয় দু'টাই। সুতরাং, বিবেচনা করা দরকার গরিলা এবং শিম্পাঞ্জী ও তাদের উত্তরসুরী মানুষের মধ্যে কিছুটা শারীরিক সামঞ্জস্য ছাড়া মানসিক কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এসব প্রাণী মানুষের Behavior এর কিছুটা অনুকরণ করতে পারে মাত্র। শারীরিক সুবিধার কারণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন পূর্বক সে মানুষের কাজকর্মের কিছুটা নকল করতে পারে মাত্র, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সক্ষমতা (Creativity) তার নাই অর্থাৎ নিজ থেকে কোন পদ্ধতি সে উদ্ভাবন করতে পারে না এবং শত প্রশিক্ষণ দেওয়া সত্বেও তাকে লেখাপড়া, ভাষা, চাষাবাদ অথবা অন্য সাংগঠনিক কাজ শিখানো যায় না, অথচ মানুষের পূর্বসুরী হিসাবে সেদিকে তাদের অন্তত কিছুটা ঝোঁক থাকা প্রয়োজন ছিল। সেদিক দিয়ে পাখিরা তাদের থেকে অনেক বেশি অনুকরণ করতে পারে। ময়না, তোতা, ভৃঙ্গরাজ ইত্যাদি পাখি মানুষের স্বর নকল করতে পারে অথচ অন্য কোন জন্তু তা পারে না।

কুকুর, ঘোড়া, হাতি, শীল মাছ ইত্যাদির বুদ্ধি বানর শ্রেণীর চাইতে কোন অংশে কম নয়।

জীব বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বিড়াল, বনবিড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদিকে বিড়াল শ্রেণীভুক্ত (Cat Family) কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদিকে কুকুর শ্রেণীভুক্ত (Dog family) এবং বানর, হনুমান, উল্লুখ, শিম্পাঞ্জী, গরিলা ইত্যাদিকে বানর পরিবার (Ape Family) ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অথচ, আকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও এদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, যেমন বিড়াল, কুকুর, বানর পোষ মানে অথচ বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, গরিলা ইত্যাদি কিছুতেই পোষ মানে না বরং মানুষকে তাদের ১নং শত্রু বলে মনে করে। এসব স্বগোত্রীয় প্রাণীদের মূল যদি এক হয় তাহলে আকার (Size) এবং প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণই– বা কি। Survival of the fittest তথা শ্রেষ্ঠ জীবের উৎপত্তি শুধু বানর শ্রেণী থেকেই হল অথচ ক্রম বিবর্তনের দ্বারা অন্য জন্তুগোষ্ঠী হতে আজ পর্যন্ত অপর কোন উন্নততর জীব এর সৃষ্টি হল না কেন?

এর পরিপ্রেক্ষিতে এখন মানুষের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার পিগ্‌মী ও বোর্নিওর নরখাদক ডায়াক্‌ হতে আরম্ভ করে ইউরোপ এশিয়ার সুসভ্য মানব সবাই যাবতীয় গুণাবলী ও মানসিক সত্তা নিয়া জন্মগ্রহণ করে। অসভ্যতম মানুষও চেষ্টা করলে যে কোন ভাষা, আচার, ব্যবহার ও লেখাপড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখতে পারে অথচ অন্য কোন প্রাণীকে সে পর্যায়ে উন্নত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। Adoptability, Adjustment এবং অনুকরণ করবার শক্তি শুধু মানুষেরই আছে। ব্যাঘ্র, নেকড়ে, কিংবা বানরপালিত মানব সন্তান হুবহু তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং তাদের সমাজে বিলীন হয়ে যেতে পারে, অথচ অন্য কোন জন্তু এভাবে মানব সমাজে মিশে যেতে পারে না। শুধু মানসিক দিক দিয়ে কেন, শারীরিক দিক দিয়েও তো মানুষের সাথে কারো মিল নেই, গড়মিলও তো কম নয়।

শুধু আকৃতির মিল থাকলেই কি হবে, মানুষজাতির শ্রেষ্ঠত্ব তো তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই, যার সাথে অন্য কোন প্রাণীর তুলনা হয় না। বুঝলাম, সে শরীর পেল বানর শ্রেণীর কাছ হতে, কিন্তু মন, মগজ, মস্তিস্ক কার কাছ থেকে পেল– যেটা তার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ? অতএব, মানুষের মূল মানুষই এবং ভবিষ্যতেও মানুষই থাকবে।

তিন.
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন মতবাদ

সৃষ্টির বিস্ময়

সৌরজগৎ যদি সূর্যের বিচ্যুত কণা হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সূর্যও নিশ্চয় বিচ্যুত অংশবিশেষ। যে মহাপিণ্ড হতে সূর্যের সৃষ্টি, সেই মহাতারকার মূল কোথায়? এভাবে ক্রমান্বয়ে মূলের সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রথম সৃষ্ট কোন এক মহাতারকার কল্পনা করতেই হবে যা হতে ক্রমান্বয়ে মহাশূন্যে বিচরণকারী সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে আর সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস সেই মহা-নক্ষত্রটি কোথা হতে আসল? জড়বাদ এবং ইন্দ্রিয়বাদের দাবী হতে প্রকৃতিগত কোন পরিবেশ এবং উৎস ও উপাদান ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না, তা হলে সে মহাপিণ্ডের উৎস কী এবং সারা মহাশূন্যের মধ্যে যেখানে অন্য কোন উপাদান থাকবার কথা নয়, মনে করুন মহাশূন্য একেবারে শূন্যই ছিল তখন এর সৃষ্টি কি করে? এটি কোথা হতে ছিটকে আসল? শাখা হতে মূল বড় হবে এটিই নিয়ম। সুতরাং অন্যান্য গ্রহ হতে সূর্য যে হারে বড় হবে, ঠিক সে রকম জ্যামিতিক হারে এর মূলগুলি বড় হয়ে আদি মূলে গিয়ে পৌঁছতে হবে; সুতরাং সে আদি পিণ্ডটি সূর্য হতে কয় হাজার কোটি গুণ বড় হবে তাও লক্ষণীয় বিষয়। শুধু তাই নয়, তাতে অন্যান্য সকল উপগ্রহ, গ্রহ ও নক্ষত্র সমূহের সমস্ত উপাদানও থাকতে হবে।

সুতরাং এত বড় এবং বৈচিত্রময় একটি জ্যোতিস্ক তৈরীর উপাদানসমূহ কে যোগান দিল, কীভাবেই– বা এই মহা কলেবর গঠিত হল এবং কার আকর্ষণেই বা এ মহাশূন্যে টিকে ছিল। যদি বলেন, মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরের হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, (অংগারক উপাদান, উদ্‌জান, যবক্ষরজান, অম্লজান, গন্ধক) ইত্যাদি ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে তা প্রাকৃতিক কারণে দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটিয়েছে, তা হলে বলতে হবে, যে কথাটি Self Contradictory বা স্ববিরোধী। কারণ, যে প্রকৃতি নিজস্ব উপাদানে একটি ছোট্ট চাঁদ অথবা পৃথিবী তৈরি করতে পারল না, তা এদেরও লক্ষ কোটি গুণ বেশি উপাদানে গঠিত একটি জগৎ কি করে সৃষ্টি করল? প্রকৃতির যত সব চক্রাকারের গ্যাস কীভাবে সৃষ্টি করল? এ গ্যাসগুলোর আগে কী ছিল? আপনাদের কল্পিত সে প্রকৃতির কার্যকলাপই– বা কখন হতে আরম্ভ হয়েছিল? এ মহাজগৎ মহাশূন্য সৃষ্টির আগেই-বা তিনি কী করতেন? তখন কি তিনি একেবারে বাচ্চা ছিলেন যে কিছু তৈরি করতে শিখেন নি? তাকে এসব সৃষ্টির শক্তি ও কলাকৌশল যোগাল কে? যে প্রকৃতি কোটি কোটি বছর ধরে সারা মহজগৎকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে আসছে, সে সাধারণ এ ভূমণ্ডমলবাসিদেরকে দৈব দূর্যোগ হতে রক্ষা করতে পারে না কেন? কেন বছরের শুরুতে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে? বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত নৈসর্গিক দূর্যোগসমূহ ঘটবার কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম নাই কেন?

যে প্রকৃতি এ ছোট্ট পৃথিবীর আবহাওয়া অথবা ভূতলের কার্যকলাপের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারল না, সে প্রকৃতি আবার কীসের বলে এ বিরাট মহাজগতকে অতুলনীয় ও নিখুঁত নিয়মে পরিচালনা করতে পারে? পৃথিবীতে কতইনা অহরহ পরিবর্তন ঘটে আসছে। পাহাড়-পর্বত সমুদ্র হয়ে যায়, আবার সমুদ্র ভরাট হয়ে পাহাড় পর্বতে পরিণত হয়। শস্য-শ্যামল ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হয় আবার মরুভূমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। কোথাও ভূমিকম্পের দরুণ সমতল ভূমি পাহাড়ে পরিণত হয় আবার পাহাড় সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। এটি কেন ঘটে? প্রাকৃতিক কারণে তো? তা হলে বুঝা যায় যে, প্রকৃতি বা স্বভাবের দ্বারা অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটাও সম্ভব। আর না হলে হিমালয়ের চুড়ায় মাছের জীবাশ্ম এবং সাহারার নিচে সবুজের নিদর্শন পাওয়া যায় কী করে! যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটা সম্ভব হয় তা হলে সৌরজগতের আবর্তনে বা ঘুর্ণনে (বার্ষিক ও আহ্নিক গতিতে) ও

অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল কেন? সূর্যের আকর্ষণে তার পরিবারবর্গ স্থিরাবস্থা অথবা একটু আধটু নড়াচড়া করা স্বাভাবিক, কিন্তু এমন সুশৃঙ্খলভাবে আবর্তন ও গতিপথ অতিক্রম করে যে, কোটি কোটি বছর ধরে তা একচুল বরাবরও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেখানে কেন অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি? কেনই বা কোন গ্রহের দৈবক্রমে কক্ষচ্যুতি ঘটেনি? কেনই বা কোন গ্রহের গতিস্লথ হয়নি বা স্থির হয়ে থাকে নি। কেনই বা দুটি গ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেনি। কোটি কোটি বছর ধরে সৌরমণ্ডলে এত নিখুঁত ভারসাম্য বা Balance কীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হল? আসলে প্রকৃতি বা স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ স্রষ্টার মহান ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্রষ্টার ইচ্ছা বা ইঙ্গিতই প্রকৃতি রূপে কাজ করে যায়।

যারা ইন্দ্রীয়বাদী বা জড়বাদী, তারা প্রকৃতি নামক স্রষ্টার দাসকেই হর্তা-কর্তা বিধাতা বলে ধরে নেয়। নিজের বিবেক বুদ্ধিকে উল্টা খাতে প্রবাহিত করার ফলে তারা নিজেদেরকে চিরমুক্ত হওয়ার পরিবর্তে গোলামের গোলামে পরিণত করল। প্রকৃতি বলুন, স্বভাব বলুন, যাই বলুন না কেন, তা কোন কিছু ঘটবার অথবা সৃষ্টি হবার উপলক্ষমাত্র। এর পিছনে ও পর্যবেক্ষণে এক মহাশক্তি রয়ে গিয়েছে যার ইঙ্গিতে বা হুকুমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবকিছু চলে। মোটকথা প্রকৃতি বা স্বভাবের কোন আকৃতি আছে কি? থাকতেও পারে না, কারণ আইনকানুন, শৃঙ্খলা বা নিয়ম কারও একটি মস্তিষ্ক-প্রসূত ধারণা মাত্র, যা সৃষ্ট যা কারও দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত, যার পিছনে একজন স্রষ্টা বা পরিকল্পকের প্রয়োজন আছে তা Abstract, কিংবা Material নয়। সাধুতার আধার যেমন সাধু, প্রেমের আধার প্রেমিক, জ্ঞানের আধার জ্ঞানী। জ্ঞানকে যেমন জ্ঞানী হতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, ঠিক তেমনি প্রকৃতিকেও ইহার প্রণয়নকারী হতে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা।

জড়বাদীরা সুযোগ-সুবিধামত প্রকৃতির অর্থ বিভিন্নভাবে করে থাকে। একে দৈবাৎ, দৈবক্রমে, এমনি ঘটনাচক্রে ইত্যাদি অর্থেও প্রকাশ করে থাকে। যেমন, তারা বলে থাকে যে, প্রায় ছয়শত কোটি বৎসর পূর্বে মহাশূন্যে এক মহাপিণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং এর সৃষ্টির মাত্র পাঁচ মিনিট পর এক বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলে তা খান খান হয়ে মাত্র আধঘন্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা, গ্রহ, উপগ্রহে পরিণত হয়। অথচ এ কথা পরিষ্কার যে, কোন পূর্বউদ্যোগ, আয়োজন ও পরিকল্পনা ছাড়া এত বিপুল পরিমাণ পদার্থ এত অল্প সময়ে সৃষ্টিই বা

কীভাবে হল, এমন সুপরিকল্পিতভাবে একত্রিতই বা কীভাবে হল এবং বিস্ফোরিত হবার জন্য এত বিপুল পরিমাণ নিউট্রন, ইলেকট্রন ও প্রোটন কে-ই বা যোগান দিল এত অল্প সময়ের মধ্যে? শুধু বিস্ফোরিত হয়ে এর কণাসমূহ এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকেনি, বরং মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে এর প্রত্যেকটি অংশ কোটি কোটি তারা, গ্রহ, উপগ্রহে পরিণত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে মহাশূন্যে আবর্তন করতে থাকে!

আবার যদিও সব গ্রহ-নক্ষত্র প্রায় প্রত্যেকটি একই উপাদানে গঠিত কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। যেমন কোনটাতে নিজস্ব আলো আছে আবার কোনটাতে নাই, কোনটাতে বায়বীয়মণ্ডল আছে এবং প্রাণীর জন্ম ও বসবাসের উপযোগী আবার কোনটা এর বিপরীত অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর প্রত্যেকটি প্রজাতির আকৃতিগত ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্রের মতই এরাও বৈচিত্রময়। এতগুলো কাজ সম্পন্ন হল, সময় মাত্র ৩০ মিনিটে! বুঝলাম, মহাপিন্ড সৃষ্টি ও পাঁচ মিনিট পর এর বিস্ফোরণ দৈবের ফল, কিন্তু ৩০ মিনিটের মধ্যে এমন সুশৃঙ্খল কোটি কোটি সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হল কি করে? সবাই জানে দুর্ঘটনা, দৈব দূর্বিপাক মানেই উদ্দেশ্যবিহীন অনভিপ্রেত কাজ, যা সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত কোন কাজের গতি রুদ্ধ অথবা লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে মাত্র, এর দ্বারা সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলক কোন কাজ অথবা গঠনমূলক কোন কিছুই সাধিত হতে পারে না। যেমন, মনে করুন কোন প্রকৌশলী এমন কোন একটি পাঁচমিশালী যন্ত্র তৈরি করে যার মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন, টেলিফোন, অয়ারলেস প্রভৃতি যন্ত্রের পার্টস বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটির বিশারদগণ ইচ্ছা করে সেগুলো বেছে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে এসব যন্ত্র তৈরি করতে পারে। কিন্তু দৈবক্রমে কোন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সে পাঁচমিশালী যন্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটল, এর ফলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কোনটা রেডিও, কোন অংশ টেলিভিশন, আবার কোনটা অন্য যন্ত্রে পরিণত হল। প্রকৃতপক্ষে এভাবে শুধু পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র নয়, এর বিশেষ কোন একটি অংশও সৃষ্টি হতে পারবে না। গ্রহ উপগ্রহের নির্মাণ কৌশলের সাক্ষাৎ এসব যন্ত্রপাতির জটিলতা কোন ছার? যে পৃথিবীর একটি অণু পরমাণুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সে শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠির ৩০০০ বৎসর সময়ের দরকার হয়, যার পদার্থ ও উপাদানসমূহের রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে কোটি কোটি বৈজ্ঞানিক হিমশিম খেয়ে যেত, এ রকম লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি কি কোন দৈব দূর্ঘটনা হতে পারে? এগুলোর পদার্থসমূহ কীভাবে সৃষ্টি হল? শক্তি হতে পদার্থ নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে

না, এর জন্য দীর্ঘসূত্রিতার প্রয়োজন। যেমন, দৈবক্রমে শক্তি হতে লৌহ কণিকার সৃষ্টি তথা হতে প্রাকৃতিক উপায়ে ইস্পাতে পরিণত হওয়া এবং শেষ পর্যায়ে একখানা তরবারিতে পরিণত হওয়া যেটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। যদিও পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে পরিণত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তা দৈবক্রমে হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। যেমন, সম্পূর্ণ মাটির উপাদানে একখানা দালান নির্মিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু দৈবক্রমে তা নির্মিত হওয়া সম্ভব নয়, এর জন্য নির্মাতা ও পরিকল্পকের নিশ্চয় প্রয়োজন আছে।

এখন সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপাদানে প্রাণ সৃষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রাণ সৃষ্টি করার পর তা দ্বারা কোন ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করা হবে তা তো বুঝাই মুশকিল। প্রাণ সৃষ্টি এবং এর বিশিষ্ট কোন জন্তুর ভ্রুণে পরিণত করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা কি কোন দিন সম্ভব হবে? জীবন সৃষ্টির পরিবেশ বলতে আমি নিম্নলিখিত পদ্ধতিটিই বুঝাচ্ছি। মনে করুন, প্রোটিন বা প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করা হল। কিন্তু তথায় কোন জন্তুর প্রাণ সৃষ্টি করবেন? শুধু কি আহার্য্য বস্তু থেকেই প্রাণ সৃষ্টি হয়, না তার সাথে যে খাবে তার শরীরের বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন আছে। যদি তাই হয়, তবে সেই প্রাণীর বীর্য হইতে অনুরূপ প্রাণীই সৃষ্টি হবে।

মনে করুন একটি কুকুর, একটি বানর ও একটি বিড়ালকে অনেক দিন ধরে একই রকম খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হল, কিন্তু প্রত্যেকের ঔরসে যে বীর্জের ও শুক্র কীটের জন্ম হবে তা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য মত হবে। শুধু সে পর্যায়টিও তো প্রাণ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত নয়, বরং অনেক পর্যায়ের একটি মাত্র পর্যায়। এরপর পরা (Positive) ও অপরার (Negative) সন্নিবেশের জন্য স্ত্রী শ্রেণীর জরায়ুতে প্রবেশ করাতে হবে এবং এইখানেও দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। পরার মূল এবং অপরার পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তাপ এবং রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলেই একটি ভ্রুণের জন্ম হয়। যেখানে উভয়েরই সৃষ্টিধর্মী প্রভাবের প্রচ্ছন্ন ছাপ বিদ্যমান থাকে। বুঝলাম, জীবকোষ তথা প্রোটিন ও প্রাণ সৃষ্টি সক্ষম হল, কিন্তু এর একটি জীবের পূর্ণাঙ্গ ভ্রুণে পরিণত করবার জন্য এসব জটিল প্রণালী বা পর্যায়সমূহ কীভাবে অতিক্রম করা সম্ভব হবে? দৈবক্রমে অথবা এমনিতেই সৃষ্টি হওয়ার মানে, পূর্বপরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যবিহীন কোন কিছু আকস্মিক ঘটা। সুতরাং এমনি দৈবাৎ যদি এতবড় সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব ও কোটি কোটি প্রাণী সৃষ্টি হয়ে আবার কোটি কোটি বছর

টিকে থাকতে পারে তা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব মানুষ কেন নিজস্ব বুদ্ধি, জ্ঞান ও সঠিক পরিকল্পনার দ্বারা আজ পর্যন্ত একটি ডালের কণাও সৃষ্টি করতে পারল না? কেন তারা আজ পর্যন্ত একটি তুচ্ছ পদার্থও সৃষ্টি করতে পারল না? তাদের সমস্ত অত্যাশ্চর্য্যজনক আবিস্কার ও সৃষ্টিসমূহকে একত্রিত করলেও কি অতি সাধারণ একটি জীবাণু বা একটি সাধারণ ঘাসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে? কিংবা একটি কবুতরের সাথে? পারে না, কারণ যাবতীয় উৎকর্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সৃষ্টি নিষ্প্রাণ, নিরস এবং শক্তিহীন। এগুলি পরের সাহায্য ছাড়া লব্ধ করতে অক্ষম, নিজে নিজে বেঁচে থাকতে অক্ষম, বংশ বৃদ্ধি করতে অসমর্থ। যারা নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে, তাদের অন্ততঃ এতটুকু শক্তি থাকা প্রয়োজন ছিল। এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিস্কারসমূহের মধ্যে এমন কিছুই নাই যা স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারে।

ডারউইন তত্ত্ব

বিবর্তনবাদীদের ধারণা, একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টির জন্য ন্যূনপক্ষে দশ লক্ষ বছরের প্রয়োজন হয়। যদি তা হয়ে থাকে, তবে পৃথিবীর সর্বমোট প্রায় দশ লক্ষ রকমের বিভিন্ন প্রাণীর আদিমূল ধরে নিতে হবে একটি এক কোষি প্রাণীকে, যেটা নাকি সর্বপ্রথম পানিতে জন্ম নিয়েছিল। দৈবক্রমে সে এককোষী জীব দ্বিকোষী বা বহুকোষী জীবে পরিণত হতেও সে হিসাবে কোটি কোটি বছরের প্রয়োজন হয়েছিল। উক্ত জীবটি মাছে পরিণত হওয়া থেকে আরম্ভ করে মানুষে পরিণত হতে অন্ততপক্ষে দশ হাজার স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন আছে এবং প্রত্যেকটি স্তরের বয়স দশ লক্ষ বছর ধরে হিসাব করলে অন্তত এক হাজার কোটি বছরের প্রয়োজন। অথচ বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেন যে, পৃথিবীর বয়স বেশির মধ্যে ৬০০ কোটি বছর। আর পৃথিবী সৃষ্টির সাথে সাথে তো জীব সৃষ্টির পরিবেশ হয়নি। এর জন্যও অন্তত কয়েকশত কোটি বছরের প্রয়োজন হয়। একটি ইঁদুরের শুকরে পরিণত হতে কয়টি স্তর অতিক্রম করতে হবে, সেখান থেকেই হিসাব করলে বিবর্তনবাদের যৌক্তিকতা অসার বলে সহজে প্রমাণিত হবে।

ডারউইন, লামার্ক ও ওয়ালেস সাহেব কয়েকটি Common factor কে বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে ধরে নিয়েছে। যেমন ভ্রুণ থাকাকালীন মৎস্য হতে

আরম্ভ করে যাবতীয় জীব-জন্তুর কংকালের মধ্যে সামঞ্জস্য, লেজ থাকা এবং দৈহিক আকৃতির মিল থাকা ইত্যাদি। প্রাণীদেরকে তো প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী। সুতরাং, যার যার শ্রেণী অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে কিছুটা মিল থাকাটাই স্বাভাবিক, তা কংকালের দিক দিয়ে হোক বা আকৃতির দিক দিয়ে হোক। এমনকি অতিকায় জন্তু ও একটি পতঙ্গের মধ্যেও অনেক সময় আকৃতির মিল দেখা যায়। যেমন বড় ফড়িং এর সম্মুখভাগ দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মত, মাকড়সা ও অক্টোপাস দেখতে প্রায় একইরকম, কিন্তু তা বলে তো জীববিজ্ঞানীরা উভয়কে একই গোত্রীয় বলতে পারেন না।

"বানর শ্রেণীর সাথে মানুষের আকৃতির বা কংকালের মিল আছে বলে মানুষও বানর শ্রেণীভুক্ত" আর "বানর শ্রেণীর এক গোত্র হতে মানুষের উৎপত্তি" এই দু'টি কথার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। আকৃতির মিলের বিবেচনায় শ্রেণীভুক্ত করলে তাতে কিছু আসে যায় না, বাঁদুড় অথবা আমাজান এলাকার উড়ন্ত টিকটিকিকে পাখি বললেও পাখি হবে না আর পেঙ্গুইনের পাখা নাই বলে তারা ছাগল হবে না। বিবর্তনবাদটাই হলো অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। মানুষের ভ্রুণের লেজের সাথে যদি বানরের লেজের তুলনা করেন তা– ধোপে টিকেনা। কারণ, ভ্রুণ জীবনের উৎসমাত্র, এর সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবের মিল থাকা বা না থাকার কিছু আসে যায় না। এর লেজটা দেখলেন, হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ যে নাই তা দেখলেন না। বটফলের ক্ষুদ্র বীজের সাথে বিরাট মহীরুহের আকৃতির কোন মিল আছে কি? বটের বীজের সাথে যদি সরিষার মিল থাকে তা হলে বলতে হবে যে বট গাছ একসময় সরিষা গাছ ছিল।

এতদিনে হয়তো জীবন সৃষ্টি বা বেঁচে থাকবার পরিবেশটাই আবিস্কৃত হল, কিন্তু জীবকোষ কিভাবে সৃষ্টি হল তা এখনও জানা যায় নি। শোনা যায়, বৈজ্ঞানিকেরা নাকি কৃত্রিম উপায়ে জীবকোষ সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না এটি আবিস্কৃত হল, ততদিন পর্যন্ত ডারউইনের মতবাদ স্থগিত রাখা উচিত। পূর্ণাঙ্গ জলজ প্রাণী যদি ক্রমান্বয়ে পুর্ণাঙ্গ স্থলজ প্রাণীতে পরিণত হতে পারে তা হলে একদিন মানুষও অক্সিজেন ছাড়া চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহে বসবাস করতে পারবে। আপাতত যতদিন না সে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ততদিন সে প্রাণরহস্যও স্থগিত রাখা যাক। পানি হতে যে সব প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে তা ১৪শত বৎসর আগে কোরআনেও বলা হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

(সূরা আম্বিয়া-৩০)।

পানি হচ্ছে মাটির রক্ত স্বরূপ। এটি ছাড়া মাটিও বন্ধ্যা। কোরআনে বলা হয়েছে মানুষকে কাদামাটি হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আরবীতে طين (তীন) অর্থ পানি ও মাটির মিশ্রিত রূপ। বীর্য বা শুক্রাণু মাটি ও পানিরই পরিণাম বা নির্যাস মাত্র। কোরআনের এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, মানবজাতির ১ম পুরুষের সৃষ্টি স্থলভাগেই হয়েছে এবং অন্যান্য জীবজন্তু ও গাছপালার ন্যায় স্বাভাবিক নিয়মেই জন্ম লাভ করেছে।

"মাটি হতে" আর "মাটি দ্বারা" সৃষ্টি করা এই দু'টির মধ্যে বিরাট তফাৎ আছে (من الطين او بالطين) 'মাটি হতে' সৃষ্টির অর্থ মাটির উপাদানে সৃষ্টি এবং এটি কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা একমাত্র আল্লাহ নিজেই জানেন। 'মাটি দ্বারা' সৃষ্টির অর্থ মাটির মূর্তি প্রস্তুত পূর্বক প্রাণ সঞ্চার করা যা আল্লাহর ফিৎরতের পরিপন্থী। কোরআন এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, পরিণত বা রূপান্তরিত করা হয় নাই (Created, not turned in to human being)। ব্যাঙাচি হতে ব্যাঙ এ পরিণত হওয়া পরবর্তী ধাপে লেজ খসে যাওয়া এবং শুয়ো পোকা হতে প্রজাপতির জন্ম হওয়া বিবর্তনের ফল নয়, রূপান্তর মাত্র। কারণ, নানা পরিবর্তনের পরেও এরা যেখান থেকে জীবকোষ সৃষ্টি বা Protoplasome লাভ করেছিল, পরিণতিতে সেখানে গিয়ে পৌঁছে, ভিন্ন কোন প্রজাতির সৃষ্টি হয় না। সবকিছু একই জীবনের মধ্যে এবং স্বল্প সময়েই সংগঠিত হয়। সে রকম পরিবর্তন কিছু না কিছু প্রত্যেক জীবের জীবনেই ঘটে থাকে।

ব্যাঙাচি পানিতে জন্ম নেয় বলে সাঁতারের সুবিধার জন্য লেজের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যায় তখন সেটা ক্রমান্বয়ে খসে পড়ে। ছাগল,

গরু, মহিষ ইত্যাদির জন্মের সময় শিং গজায় না, যৌবনে পৌঁছলে প্রয়োজনের তাগিদেই শিং গজায়। জন্মলগ্নে মানব শিশুর দন্ত, দাড়ি, গোঁফ থাকে না, কিন্তু সময়মত সেগুলি গজায়। বিভিন্ন প্রাণীর বয়স অনুপাতে রং আকার এবং আকৃতির পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোন মৌলিক পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। মৌমাছির শুয়ো মৌমাছিই হয় এবং বানরের বাচ্চা বানরই হয়। ডারউইন সাহেবের মতে, বর্তমান species গুলির পূর্বপুরুষেরা Surounding circumstance বা পরিবেশের সাথে খাপ খেতে না পেরে টিকে থাকতে পারে না, ক্রমান্বয়ে তাদের বংশ লোপ পেয়েছে। কিন্তু মানুষ এমন এক অনন্যসাধারণ জীব যা নিজ বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কার্যক্ষমতা বলে পৃথিবীর সব রকমের আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে পৃথিবীর সর্বত্র টিকে থাকতে সক্ষম হয়। কি উষ্ণতম মরুঅঞ্চল, কি ঘন অরণ্যময় বিষুবীয় অঞ্চল অথবা নির্জন দ্বীপ সর্বত্রই মানুষের বিচরণক্ষেত্র। সুতরাং এমন এক বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও কর্মঠ জীব যে সরাসরি বানর শ্রেণীর কোন একগোষ্ঠী হতে জন্ম নেয় না এটা সত্য কথা। নিশ্চয় এক বা একাধিক স্তর অতিক্রম করে বর্তমান স্তরে আসে।

অতএব, মানুষের নিকটতম পুর্বপুরুষেরা বুদ্ধি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে ও অন্যান্য জীবজন্তুদের থেকে কিছুটা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। যে পরিবেশে মশা, মাছি, পিঁপড়াসহ যাবতীয় কীটপতঙ্গ এবং গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণের মত নিরীহ জন্তু এবং হাঁস-মুরগির মত অসহায় পক্ষী বেঁচে থাকতে সক্ষম হল, সেখানে আদি মানবদের মত চালাক চতুর চটপটে (যাহা হওয়া স্বাভাবিক) প্রাণী বেঁচে থাকতে সক্ষম হল না কেন? তারা কি কোন এক শুভক্ষণে শুভলগ্নে একসাথে মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল? লক্ষ লক্ষ বছর আগের হাঁড়-গোড় বা জীবাশ্মের উপর গবেষণা চালিয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কতটুকু বাস্তবভিত্তিক বা অনুমানভিত্তিক তা বলা কঠিন। কারণ, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ধারা সঠিক প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং অনেকাংশে শুধু অনুমানের উপরেই নির্ভর করতে হবে। অনুমান সত্য হতে পারে অথবা মিথ্যাও হতে পারে, ডায়োনিসিয়াস অথবা অতিকায় হস্তির বিলুপ্তি হয়ে কংকালের অস্তিত্ব বিবর্তনবাদের কোন প্রমাণ হতে পারে না।

কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে কোন প্রাণীগোষ্ঠীর বিলুপ্তি অসম্ভব নয় বরং তাদের মধ্য হতে speceis এর উৎপত্তিই হবে বাস্তব বহির্ভূত। ডায়নোসরের বংশধর আর পৃথিবীতে বেঁচে নাই, কিন্তু অতিকায় হস্তির বংশধরেরা বেঁচে আছে, অন্য কোন ভিন্ন প্রাণীতে বিবর্তিত হয় নাই। যুগ, আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে জীবের আকার ও রংয়ের মধ্যে প্রভেদ হতে পারে, কিন্তু Originality এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যেমন, কোন কোন অঞ্চলের জীবজন্তু বা মানুষের মধ্যে আকার ও রংয়ের পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু তাই বলে একটি অপরের speceis বলা যায় না, হাতি যত বড় বা ছোট হোক হাতিই, মানুষ যত বড় বা ছোট হোক মানুষই। জীবজন্তুর জন্মগত প্রবৃত্তি (Instinct) ও একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য হলো, যে বয়সে মানব শিশু হাঁটতে শিখে সে বয়সে অন্যান্য প্রাণীরা প্রায় যৌবনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে। বানর শ্রেণীর প্রত্যেকেরই গায়ে লোম আছে অথচ বিশেষ বিশেষ স্থান ছাড়া মানুষের গায়ে লোম নাই। মানুষের পূর্বপুরুষের যদি লোম থাকত তা হলে অবস্থা ও পরিবেশের তাগিদে মানুষেরও লোম গজাত। যথা, মেরু অঞ্চলের শৃগাল, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির লম্বা পশম গজায় কিন্তু তথাকার মানুষের গায়ে তা গজায় না। এতে প্রমাণ হয় যে, মানুষ অন্য কোন জীবের উত্তরসুরী নয়। চতুষ্পদ জন্তুদের চলাফেরা, লাফঝাঁপ, দৌঁড় ইত্যাদিতে ভারসাম্যের জন্য লেজের প্রয়োজন আছে। যেসব জন্তুদের হাত নাই, শরীর স্থুলকায়, তাদের মশা-মাছি তাড়াবার জন্য লেজের প্রয়োজন হয়। মানুষ দ্বিপদ প্রাণী এবং তার মেরুদণ্ড খাড়া, প্রয়োজন বোধে সর্বাঙ্গে হস্তদ্বয় পরিচালনা করতে সক্ষম এবং ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য লেজের কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই তাদের কোন কালেই লেজ ছিল না। এটাই বিধির বিধান যে, কোন জীবজন্তুর শরীরে কোন নিস্প্রয়োজনীয় অঙ্গ নেই। আর প্রয়োজনের কম কোন অঙ্গও নেই। জলের মধ্যে যেমন প্রাণী জন্মাবার এবং বসবাস করবার পরিবেশ আছে, তদ্রূপ স্থলভাগেও সে অবস্থা বিদ্যমান।

অন্যান্য প্রাণীদের পূর্বসুরীরা কী পানিতে বসবাস করত, না স্থলভাগে বসবাস করত তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, অন্তত পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অন্য কোন ভিন্ন জাতীয় জীবের species নয়। জ্ঞানে, গুণে, বুদ্ধিমত্তায় ও সৌন্দর্যে যে প্রাণীর সাথে আর কোন প্রাণীর তুলনা হয় না, তারা নিশ্চয় স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বিবর্তিত হবার জন্য নাকি লক্ষ লক্ষ বছরের প্রয়োজন হয়। যদি তাই হয়, তবে পৃথিবীর

সকল প্রাণীর পূর্বপুরুষেরা এক সঙ্গে বিভিন্ন যুগে পালাক্রমে খোলস বদলিয়ে ফেলতো। যদি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রাণীর রূপান্তরিত হবার পালা পড়ে থাকে তা হলে মানব সভ্যতার বয়ঃসীমার মধ্যে এমন একটি প্রাণীরও পালা পড়ল না যার বিবর্তনের সময় হয়েছে? অন্তত ২০/৩০ হাজার বছরের মধ্যে এই ধরনের কোন প্রমাণ আছে কী যে, অন্তত একটি সোনাব্যাঙও কুনোব্যাঙ এ পরিণত হয়েছিল? অনুমানের চাইতে বাস্তবে প্রমাণের মূল্য অনেক বেশি নয় কি? ডারউইন সাহেব তার মতবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও তাকে শেষপর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার মত মাল-মসলা এবং বাস্তবভিত্তিক যুক্তিপ্রমাণ যোগান দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সাফল্য এখানেই যে, তার মতবাদের দ্বারা তিনি বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং অনেকের পূর্ববর্তী ধারণাকে পাল্টিয়ে তাদেরকে স্বমতে আনতে পেরেছেন।

মহাজগতের রহস্যের মত মানব ও অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনও মানুষের সীমিত জ্ঞানের অসাধ্য। অনুমান ছাড়া কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং অনুমান যে সত্য হবে তার নিশ্চয়তাই– বা কী। চিন্তা যেখানে খেই হারিয়ে ফেলে সেখানে একমাত্র ঐশী বাণীর উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। গভীর অরণ্যে পথ প্রদর্শক ছাড়া আনাড়ী পথিকের প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। পথ হারিয়ে বনবাসী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও অমূলক নয়। মানুষ জাতির জয়গানই স্রষ্টার কাম্য। কিন্তু, মানুষ জ্ঞানের গরিমায় ইচ্ছাপূর্বক নিজেদেরকে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করতে সদা প্রয়াসী।

সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের হোতা কার্ল মার্কস এর পরম গুরু হচ্ছেন ডারউইন। ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ হতে তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনবাদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ডারউইনের মতবাদ যেমন আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জগতকে অস্বীকার করে, তদানুরূপ কার্ল মার্কসও একই পথে চালিত হন। তার মতে, মানবজাতির ইতিহাস শোষণের ইতিহাস। রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র, সমাজ, ধর্ম প্রত্যেকটিই অবাধ শোষণের এক একটি উপকরণমাত্র এবং শোষণের উদ্দেশ্যেই এদের সৃষ্টি। বিশেষ করে ধর্মের উপর তিনি খড়গহস্ত এবং শোষিতদের ঘুম পাড়ানোর জন্য এটি আফিমের মত ক্রিয়া করে বলে

তার ধারণা। তার এই মানসিকতার প্রধান কারণ, তিনি ইউরোপবাসী এবং জন্মলগ্ন হতেই সেখানকার যাজকদের ধর্মের নামে শোষণ লক্ষ্য করে আসছিলেন এবং শোষক সম্প্রদায়ের উপর তাদের মৌন সমর্থনও লক্ষ্যণীয় ছিল। কিন্তু তাই বলে পাইকারীভাবে সকল ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাকে দায়ী করা যায় না। উৎপীড়ন, অবাধ শোষণ, পরের ধন আহরণ ইত্যাদি অপকর্ম মূলত কোন ধর্মেরই লক্ষ্য হতে পারে না, অনুমোদন লাভ করতে পারে না।

হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), বুদ্ধ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রত্যেকেই ধনসম্পদ জমা করতে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং ধনসম্পদের লোভ হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে হযরত মুসা (আঃ) ও কারুনের কাহিনী একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত মোহাম্মদ (সঃ), যার জীবনের অধিকাংশ সময় অনাহার, অর্ধাহার ও উপবাসে কাটিয়েছেন, মৃত্যুর পর যাঁর পরিবারের জন্য একটি কর্পদকও রেখে যাননি, তাঁর কি শোষকদের প্রতি কোন সহানুভূতি থাকতে পারে? অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর আদেশ-উপদেশ ও নির্দেশসমূহ গ্রন্থাকারে এখনও লিপিবদ্ধ আছে, যার ইচ্ছা সে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারে (Comparative study)। ধন-দৌলত জমা করবার মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কোরানের একটি আয়াতই (সুরা হুমাযাহ্) যথেষ্ট (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) সামাজিক বিবর্তনবাদ ও অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস শোষণের অন্যান্য উপকরণসমূহের মধ্যে ধর্মকেও শামিল করেছেন। তার মতে, ধর্মসমূহের উৎপত্তির কারণ এই, তা অর্থনৈতিক এবং শোষকের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়েছিল। তার এই অপবাদের উত্তর ধর্মসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেয়া যেতে পারে।

একমাত্র ইসলাম ও এর মহান প্রবর্তক মোহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম বা প্রবর্তকের বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে জানতে হলে ধর্মগ্রন্থসমূহ (The books, Scripture, Bible, Old Testament) সমসাময়িক প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তি, অথবা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও শিলালিপি ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হবে। মার্কস যেহেতু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, কাজেই তার ইতিহাস পর্যালোচনা যে ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হবে না এটা জানা কথা। অথচ ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়াদি হচ্ছে

সমসাময়িক যুগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। অন্যান্য উপকরণাদি নিছক অনুমান ভিত্তিক বৈ আর কিছুই নয়।

হিব্রু জাতির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে একমাত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, সমসাময়িক রাজা, ধনী সামন্ত সম্প্রদায় ও অননুমোদিত ধর্মের পুরোহিতরাই তাঁর ধর্মের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি নবীদের মিশন তাদের স্বার্থেই পরিচালিত হত, তবে বাধা দেওয়ার কারণই বা কী ছিল? ইব্রাহীম (আঃ) এর বৈরী ছিল নমরূদ, হুদ (আঃ) বনাম শাদ্দাদ, মুসা (আঃ) বনাম ফেরাউন ও কারুন, দাউদ (আঃ) বনাম জালুত, এইভাবে হযরত আলয়াসা', জকরিয়া, য়াহইয়া, 'ঈসা প্রত্যেকেই সমসাময়িক রাজা ও ধনিক সম্প্রদায় কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ও উৎপীড়িত হয়েছিলেন। বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন বিধায় তাঁর সুখ সাচ্ছন্দের কোন অভাব ছিল না। তখন রাজতন্ত্র কিংবা শোষণের বিরুদ্ধে এমন কোন আন্দোলনও গড়ে উঠেনি, যা দমনের জন্য তাকে ধর্মের আবরণ পরতে হয়েছিল। আজীবন ত্যাগ ও অহিংসার মন্ত্রই প্রচার করেছিলেন। তাতে শোষণের কি আভাস পাওয়া যায়? তাঁর অনুসারী অশোক ও হর্ষবর্ধন দান-দক্ষিণায়, ত্যাগে, ন্যায়বিচারে ও জনহিতকর কার্যে সে যুগের আদর্শ নৃপতি ছিলেন। আধুনিক যুগের চিন্তাধারা নিয়ে তাদেরকে শোষক ও স্বৈরাচারী বলে অপবাদ দিলে চলবে না, কারণ তখন তো গণমনে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বীজ অংকুরিত হয়নি। তাঁরা তো আর গণ সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা গ্রহণ করেনি। হযরত ঈসা (আঃ) যে ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, তাঁর এ উক্তি হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় – "সুঁচের ছিদ্র দিয়ে যেমন একটি উটের প্রবেশ অসম্ভব, ধনীদের স্বর্গে প্রবেশ করাও তেমন অবান্তর।" ইসলামের নবীর (সঃ) কথা চিন্তা করে দেখুন, যখন কুরাইশ নেতারা প্রস্তাব করল যে, পাহাড় প্রমাণ ধনরত্ন আপনাকে দেওয়া হবে, যদি আপনি ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন। এর উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন তা সবারই জানা কথা। রাজত্ব করার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন নি, অর্ধাহার, অনাহার ও চীরবাসে জীবন-যাপন করেন, অকাতরে গরীব দুঃখীদের মধ্যে ধনরত্ন দিয়ে দেন।

একদিকে খাইবার বিজয়লব্ধ উটের কাফেলায় মদীনায় মসজিদের প্রাঙ্গন ভরে যায়, অপরদিকে তাঁর ঘরে উপবাসের পালা চলতে থাকে। এই যাবৎ এ

রকম নজীর কেউ স্থাপন করতে পেরেছেন কি? কার্ল মার্কস এ রকম চরিত্রে শোষণের কি চিহ্ন পেতে পারে? তাঁরই অনুসারী প্রথম চার খলীফা, ২য় ওমর, দাস বংশের বাদশাহ্ নাসিরুদ্দিন, আওরঙ্গজেব সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন না? যাঁরা অগাধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী কোষাগার হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না, অথচ সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্যও পরিচালনা করতেন, তাঁরা কি শোষক ছিলেন? এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ২য় ওমরের আমলে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ডাক দেওয়া সত্ত্বেও খয়রাত জাকাৎ নেওয়ার লোক পাওয়া যেত না। কোন রাজ্যে শোষণ চললে কি অর্থনৈতিক অবস্থা এত ভাল হতে পারে? সুদ, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দালালী ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ, যাকাৎ ফিতরার প্রবর্তন, খয়রাত, যাকাৎ ও কর্জে হাসানাহ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান, কোষাগার হতে গরীবদেরকে ভাতাদান, ইত্যাদি কি শোষণের ইঙ্গিৎ বহন করে?

যদি কোন ধর্মের যাজক সম্প্রদায় পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারা জনগণকে শোষণ করে তা দৃষ্টে মূলত ধর্মকে দায়ী করা যায় না। কারণ, ব্যক্তির চাইতে নীতি অনেক বড়। হাজার হাজার বছর পর ধর্মের মূলনীতিসমূহ কুসংস্কার দ্বারা শিথিল হওয়া সম্ভব। আমূল সংস্কার দ্বারা তা সংশোধন করা যেতে পারে। উচ্ছেদ করবার কোন প্রয়োজন নেই। সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান বলীদান, নরবলী ইত্যাদি প্রথার উচ্ছেদ এবং বিধবা বিবাহ–আইন প্রবর্তন, বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইন সংশোধন ইত্যাদি হিন্দু ধর্মে সংশোধনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ধর্মের উৎপত্তির হাজার বছর পর তার পরিণতির ইতিহাস ও প্রকৃতি এক হতে পারে না। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের স্থান অবশ্যই স্বতন্ত্র। অন্যান্য ধর্মে শুধু পরকালের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, ইহকালকে মায়া নামে অভিহিত করে জনগণকে বৈরাগ্য ও সংসারের উদাসীনতার শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ইসলাম ইহকাল ও পরকালকে সমানভাবে গুরুত্ব দান করেছে। আবেগ প্রবণতা ও ভক্তিভরে জর্জরিত হয়ে নয়, অথবা পক্ষপাত ও বিদ্বেষ পোষণের দ্বারা নয় বরং নিরপেক্ষ তুলনামূলক পর্যালোচনার দ্বারা বিচার বিবেচনা করা উচিত। ইসলাম একটি সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও পৌরহিত্যবর্জিত বাস্তবভিত্তিক ধর্ম। ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগের যে কোন মতবাদকে একমাত্র ইসলামই চ্যালেঞ্জ করতে পারে, অন্যকোন ধর্ম নয়। এটি দিতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা আইন-কানুন, নৈতিকতাবোধ সম্বন্ধীয় যে কোন সমস্যার সমাধান। তাছাড়া ইসলামের আরও একটি রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যার নাম আধ্যাত্মিক জগৎ। মানুষের নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করতে, চরিত্র সংশোধন করতে ও মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে এর জুড়ি নেই। ইসলাম জগতকে যা দিতে পারে, সমাজতন্ত্র অথবা আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্র তা দিতে পারে না। সমাজতন্ত্র দিতে চায় পেটের খাদ্য, পরনের কাপড়, থাকবার ঘর, যা মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন। কিন্তু কেড়ে নেয় যাবতীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পারিবারিক শান্তি। অর্থাৎ খাদ্য ও বস্ত্রের বিনিময়ে নাগরিকদেরকে নিরব যন্ত্রে অথবা কৃতদাসে পরিণত করবে। অপরদিকে, গণতন্ত্র দিতে চায় যাবতীয় ব্যক্তি স্বাধীনতার আশ্বাস, কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, কিংবা মাথা গুজাবার জন্য ঘরের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। অথচ একমাত্র ইসলামই পারে উভয়বিধ সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে।

সমাজতন্ত্রের অসারতা

কম্যুনিজমের মূল উদ্দেশ্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজি বা মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে না। সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা থাকবে এবং সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বশেষ পর্যায়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধিত হবে, অর্থাৎ যা কায়েম হলে মানুষ স্বর্গ রাজ্যে বাস করবে। কিন্তু মার্কস বর্ণিত বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্র বা স্বর্গরাজ্য আজ পর্যন্ত কোথাও কায়েম হয়নি, না রাশিয়ায়, না চীনে না যুগোস্লাভিয়ায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মূল শর্তগুলোকে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, এটি আদৌ কায়েম হতে পারে না। প্রথমে পুঁজির কথা ধরা যাক, এটা কি শুধু মেহনতি মানুষের অর্থ শোষণের দ্বারা সৃষ্টি হয়, নাকি ব্যক্তিগত মেধা, মনন ও পরিশ্রমের দ্বারাও করা সম্ভব? উভয় উপায়ে পুঁজির সৃষ্টি হতে পারে। শোষণের দ্বারাও সৃষ্টি হতে পারে অথবা ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পরিশ্রমের দ্বারাও সৃষ্টি হতে পারে অথবা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ক্রম মজুদের দ্বারাও হতে পারে। পুঁজিমাত্রই যে শোষণের ফল তা ঠিক নয়। অনেকেই পুঁজি গঠনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ উদাহরণটি উদ্ধৃত করেন যে, যদি কোথায়ও উচুঁ মাটির ঢিবি তৈরি করা হয় তা হলে অপর জায়গা হতে মাটি খনন করে আনতে হবে, ফলে সেই জায়গায় গর্তের সৃষ্টি

হবে এবং দুই জায়গায় উচ্চতার এবং নিম্নতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখা দিবে। যেহেতু পুঁজি শোষণের ফল, সেজন্য পুঁজি সৃষ্টির ফলেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক নিয়মেও মাটি উঁচু নিচু হতে পারে। একজনের কঠোর পরিশ্রমের উদ্বৃত্ত অংশের সঞ্চয়, অপরজনের অকর্মন্য অথবা আলস্যের ফলে আয়ে যে ঘাটতি, এর ফলেও তো উঁচুনিচু শ্রেণির সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু মানুষের কর্মদক্ষতা, ক্ষিপ্রতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও মেধার মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে, সেজন্য সব মানুষের কার্যক্ষমতা সমান নয়, ফলে পুঁজি সৃষ্টি হতে বাধ্য। পুঁজি আদৌ সৃষ্টি না হওয়াও শোষণের একটি পরোক্ষ ফল।

মনে করুন, দু'জন শ্রমিককে ১০০ মণ গম অপসারণের জন্য নিয়োগ করা হল, ১ জনের বহনের ক্ষমতা প্রতি বারে ১ মণ, অপর জনের ৩০ সের। দুই জনে মিলে সমস্ত গম অপসারিত করল আর আপনি সাম্যের ভিত্তিতে উভয়কে সমান বেতন দিলেন। এখানে কি ১ম জনের শ্রমের অর্থ ২য় জনে শোষণ করেনি? যদি Capacity অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হত তাহলে ২য় জনের তুলনায় ১ম জনের কি কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত না? আর এ উদ্বৃত্ত কি ক্রমান্বয়ে পুঁজিতে পরিণত হতে পারত না? এই পুঁজিকে কি অবৈধ বলা যায়? অথবা, দুই প্লট জমি দুইজন চাষীকে চাষ করত দেওয়া হল, প্রথম জন ভাল বীজ, সার এবং উত্তম রূপে চাষ করে ভাল ফসল উৎপাদন করল, ২য় জন যা তা করে চাষ করে ফসল উৎপাদন করল। ১ম জনের উদ্বৃত্ত উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে পুঁজিতে পরিণত হতে পারে এবং এ পুঁজি যদি সে অকর্মন্য চাষীকে বন্টন করে দেয়া হয় তাহলে নিশ্চয় তাকে শোষণ করা হয়। আর, যে পুঁজি মুনাফাখোর, মজুতদার, মধ্যসত্বভোগী আর সুদখোর ইত্যাদিদের দ্বারা সঞ্চয় হয় তা নিশ্চয় অবৈধ। এ ধরনের পুঁজিকে কোন ধর্মীয়, রাজনৈতিক অথবা কোন অর্থনৈতিক মতবাদই অনুমোদন করতে পারে না, কারণ তা মেহনতি ও গরীব জনসাধারণকে অবাধ শোষণ করেই সৃষ্টি হয়েছে এবং মূলধন নির্বিশেষ এ পুঁজির অবসান সবারই কাম্য। এ পুঁজি যদি মালিকের বিলাস বাহুল্যে ব্যয়িত হয় অথবা কোন উৎপাদনের কাজে ব্যয় না হয়ে অকেজোভাবে সিন্দুকে পড়ে থাকে, তাহলে তা আরও মারাত্মক। যদি বৈধ পুঁজি উৎপাদনের কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলে এক দিকে শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় ও সামগ্রিক উন্নতি হয়। পুঁজির শ্রেণী বিন্যাস না করে সমুদয় পুঁজিকে উৎখাত করা হলো পরোক্ষভাবে শোষণকেই প্রশ্রয় দেওয়া।

শোষণ বা Exploitation বলতে কী বুঝায়? একজনের মেহনতের ফল অপরজন অবৈধভাবে ভোগ করাকে শোষণ বলে। শোষক ব্যক্তিও হতে পারে অথবা সরকারও হতে পারে। যাকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলা হয়। মেহনতি জনগণের উৎপাদনের উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করার অধিকারী একমাত্র তারাই। যদি তাদের কল্যাণের নাম দিয়ে সরকার সমুদয় উদ্বৃত্তাংশ নিয়ে যায় এবং বিরাট অংশ Commission ও পলিটব্যুরোর সদস্যদের ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহলে আগেকার সামন্ত ও রাজা বাদশাহদের চরিত্র আর এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ঘানির তেল দিয়ে যেমন ঘানি মসৃণ রাখা হয়, মেহনতি জনতার টাকা দিয়ে তাদের দমন শোষণ এবং ভূমিদাসে পরিণত করবার জন্য K.G.B পোষণ করা হয়। বিশ্বের জটিলতম প্রশাসনের যাঁতাকলকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য জগতের বৃহত্তম সেনাবাহিনী গঠন করা হয় এবং ব্যয়বহুল মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্পায়িত দেশ হওয়া সত্ত্বেও জনগণের জীবনযাত্রার মান পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর চাইতে অনেক নিচে। তার কারণ, তারা নিজ উৎপাদিত সম্পদ নিজে ভোগ করতে পারে না, বরং আগেকার রাজা বাদশাহদের মত রাষ্ট্রীয় ধনাগারে জমা করা হয়। হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের অথবা ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিবর্তে তারা পেল কোন প্রকারে বেঁচে থাকবার ন্যূনতম অধিকার। তথাকার জনগণ স্বর্গসুখ ভোগ করছে, না কী মর্ম যাতনায় দগ্ধ হয়ে মরছে তা জানবার কোন উপায় নাই। সেখানে না আছে কোন স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার, না আছে কোন সংবাদ বাইরে যাবার উপায়।

যে দেশ একবার কম্যুনিস্ট কবলিত হয়েছে তা কম্যুনিজমের নাগপাশ থেকে বের হয়ে যাবার আর কোন উপায় থাকে না। তাদের শোষণ পদ্ধতি এত জটিল এবং প্যাঁচানো যে, তা হতে মুক্ত হওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। জনগণের ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড এবং চেকোশ্লভাকিয়ার নিষ্ফল গণবিপ্লব এর প্রমাণ। তাছাড়া কম্যুনিস্ট কবলিত দেশে মেহনতি জনতার শত্রু নাম দিয়ে ধনিক, বনিক এবং জমিদার ও বুদ্ধিজীবিদেরকে মেরে ফেলা হয়। যুদ্ধ জয়ের পর বিরোধী চক্রকে সমূলে উৎখাত করা হয়। নতুন সমাজের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়না। ক্ষমা ও দয়া বলে কোন শব্দ তাদের অভিধানে নাই। আদর্শের দিক দিয়ে তাদের এ আচরণ এবং ইসলামের নবীর মক্কা বিজয়ের

পরবর্তী আচরণের সাথে তুলনা করা উচিৎ। যে মতবাদ সার্বজনীন মঙ্গল সাধন করতে পারে না, তা গ্রহণযোগ্যও হতে পারে না।

রাশিয়া ও চীনের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে সে দেশগুলো বিপুল আয়তন, খনিজসম্পদ, বনজ ও কৃষিজ সম্পদের অবদান কম নয়। শুধু মতবাদের পদ্ধতির দ্বারা যদি এ সাফল্য অর্জিত হত তাহলে অন্যান্য ছোটখাট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সে সাফল্য অর্জিত হয়নি কেন? ২য় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত রাশিয়া বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে নি। যুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের রাজ্যসমূহকে নিয়ে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তাছাড়া জার সাম্রাজ্যের বিরাট অঞ্চলের উত্তরাধিকার হয়, যার আয়তন মূল রাশিয়ার চার গুণের চাইতেও বড়। অপরদিকে চীনের অবস্থাও অভিন্ন। খাস চীনের আয়তন ১৫ লক্ষ বর্গমাইল, অথচ বৃহত্তর চীনের আয়তন ৪৫ লক্ষ বর্গমাইল। এছাড়া তার কয়েকটি প্রভাবিত রাজ্যও রয়েছে। সুতরাং এত বড় সাম্রাজ্যকে শোষণ করতে পারলে উন্নয়নের জন্য কোন তন্ত্রের দরকার হয় না।

ব্যক্তি মালিকানা বা যৌথ শ্রমব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। স্বার্থপরতা বা লাভ লোকসান সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা মানুষের স্বভাবের জন্য নতুন কিছু নয়। যে কোন উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে তারা নিজ লাভ লোকসানের কথা আগে চিন্তা করে দেখবে এবং তার উপর ভিত্তি করে কাজের উদ্যম ও প্রেরণা প্রাপ্ত হবে। মনে করুন, "ক" ও "খ" কে দু'টি দোকান পরিচালনার ভার দেওয়া হল। "ক" কে দোকানের পূর্ণ মালিকানা দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ মুনাফার অধিকার দেওয়া হল। আর "খ" কে দোকানের ও মুনাফার মালিকানা দেওয়া হল না, বরং তার জন্য বেতন ধার্য্য করা হল। সুতরাং এই দু'জনের দোকান পরিচালনার উদ্যম ও অনুপ্রেরণার মধ্যে যে, যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে তা বলাই বাহুল্য। আর যদি বলেন যে দেশে কোন ব্যক্তিগত দোকানই থাকবে না সেখানে তো তারতম্যের কোন অবকাশ নাই। কথা সত্য, কিন্তু তথায় হয়তো ক্রেতাদেরকে দুঃখ পোহাতে হবে, না হয় দোকানদারের গাফিলতির ভর্তুকি সরকার তথা জনগণকেই বহন করতে হবে। এটা অন্তত কোনদিন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে না।

রাশিয়াসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সংশোধন নীতি এ ইঙ্গিত বহন করে নাকি? যৌথখামার বা শিল্প পরিচালনার পরিণতিও একই রকম। Every

body's duty, no one's duty বলে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। যে কোন কাজে একার উপর দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে যদি দশজনকে সমানভাবে দায়ী করা হয়, তা হলে কর্তব্য কাজে শিথিলতা, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, মতের অনৈক্য ইত্যাদি কারণে সে কাজ কোন দিনই ভালভাবে চলতে পারে না। যদি বলেন, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ", এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করলে কৃতকার্য না হওয়ার কোন কারণ নাই। কথা ঠিক, কিন্তু এ প্রেরণা বেশি দিন টিকতে পারে না। রাশিয়া ও চীনে প্রথম প্রথম এই প্রেরণায় বেশ সাফল্য অর্জন করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে এর স্বাভাবিক পরিণাম যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। উভয় দেশে বিপুল খাদ্য ঘাটতি এবং পুঁজিবাদি দেশগুলোর তুলনায় একর প্রতি নিম্ন ফলন এর প্রমাণ। যদি বলেন, এতদসত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো শিল্পের ক্ষেত্রে এবং কারিগরি বিদ্যায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তা হলে বলতে হবে যে, পুঁজিবাদি দেশগুলোতে ধর্মঘট, লক আউট ইত্যাদি দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের কাজের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটে তা যদি না হত এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মত মজুরদেরকে দাসের মত খাটাতে পারত আর তাদের মত স্বল্প মজুরী দিয়ে ব্যবস্থা করতে পারত, তা হলে কি এত দিনে কৃষি উৎপাদনের মত আকাশ-পাতাল তফাৎ হত না?

ইউরোপ ও আমেরিকাকে বাদ দিয়ে শুধু জাপানের সাথে রাশিয়ার তুলনা করুন। ২য় মহাযুদ্ধোত্তর কালে কোন দেশের কত হাজার কর্মঘন্টা নষ্ট হয়েছে, বার্ষিক কার কত অগ্রগতি হয়েছে, এবং মজুরী ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কি তারতম্য রয়েছে?

সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সম্পদের সুষম বন্টন

সাম্যের সংজ্ঞা কয়েক প্রকারের হতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারের সমতা, নাগরিক অধিকারের সমতা অথবা সম্পদ ভোগের অধিকারের সমতা। সমাজতন্ত্র ও পাশ্চাত্য উভয়েই সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবিদার। কিন্তু, আসলে কে কতটুকু সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে তা-ই আলোচনার বিষয়। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সাম্যের তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ, অবাধ শোষণের বিরুদ্ধে সেখানে আদতে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় না। যাদের নামই পুঁজিবাদী, সেখানে পুঁজির অথবা শোষণের উৎখাতের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাকি রইল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের সাম্য। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে উক্ত অধিকার অনেক সময় প্রহসনে পরিণত হলেও

অন্তত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চাইতেও যে অনেক বেশি ভোগ করতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেও সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব নয়। কারণ, শ্রমিকদেরকে হয়তো যোগ্যতা অনুসারে বেতন দিতে হবে, না হয় প্রয়োজন অনুসারে। উভয়ক্ষেত্রে বেতনের তারতম্য ঘটতে বাধ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বেতনের Data সংগ্রহ করে দেখা গিয়েছে যে, সেখানে বেতনের তারতম্যের হার পুঁজিবাদী দেশগুলির চাইতে কোন অংশে কম নয়। আনুপাতিক হার অনেকক্ষেত্রে নাকি ১ঃ১২০ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।

সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্য অথবা সম্পদের সুষম বন্টন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেশ কিছু দিন আগে সংবাদ মারফৎ জানা গিয়েছে যে, মস্কোতে এক বিশেষ ধরনের বিপনির বন্দোবস্ত আছে যেখানে শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ কম্যুনিষ্ট সদস্যরাই সস্তা দরে ভাল জিনিস খরিদ করতে পারে। এটি কি অর্থনৈতিক সাম্যের লক্ষণ? রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে সেখানে কোন বালাই নেই সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা, যারা মোট জনসংখ্যার সামান্যতম অংশমাত্র, সারা দেশকে শাসন করে এবং বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ তাদের আজ্ঞাবহ পুতুলে পরিণত হয়। দেশের রাজনৈতিক নাম দেওয়া হয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, অথচ না আছে সেখানে গণতন্ত্র না আছে প্রজাতন্ত্রের কোন আদর্শ। বরং মেহনতি জনতার স্বার্থ রক্ষার নাম দিয়ে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রই কায়েম করা হয়। কার্ল মার্কসের বহু আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্র বা সাম্য আজ পর্যন্ত কোন দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধুনা যে সব দেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে পরিচিত, সেগুলি ৬০ বছর অতিবাহিত হবার পরও মার্কসীয় আদর্শের প্রাথমিক স্তরও অতিবাহিত করতে পারেনি। আগামীতে উক্ত দেশসমূহে পূর্ণ সমাজতন্ত্র কোন দিন কায়েম হবে কিনা তা একমাত্র ইতিহাসই বলে দিবে।

রাশিয়ার সংশোধনবাদ, চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে পরিবেশের সাথে মিল রেখে আয়ুর্বেদিক সাম্যবাদের পাঁয়তারা ইত্যাদি দ্বারা এর ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ বলে মনে হয় না। কাজেই ডারউইন, মার্কস অথবা অন্য কোন নাস্তিক চিন্তাবিদের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে মানুষের জাতীয়, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা ছাড়া আর কোন ফায়দা নেই। কারও অন্ধ অনুকরণের চাইতে নিজের বিবেকবুদ্ধি ও

অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য অনুসন্ধান করা অনেক শ্রেয়। নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করতঃ উভয় চিন্তাবিদই মানবজাতির জন্মগত ও মৌলিক মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছেন। একজন মূল খুঁজতে গিয়ে মানবজাতিকে ব্যাঙ ও বানরের অধঃস্থন পুরুষে পরিণত করেছেন, অপরজন অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাম্যের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষকে নিছক যন্ত্র অথবা ধামাধরা আজ্ঞাবহ কৃতদাসে পরিণত করেছেন।

বহুঈশ্বরবাদ ও বিবিধ ধর্মীয় তত্ত্ব

স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অবশ্য বর্তমান যুগে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়েই যত তর্ক-বিতর্ক। যে একবার স্রষ্টাকে স্বীকার করে, তাঁর একত্ববাদ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন তোলেনি। কারণ, স্রষ্টা যে একজনই হবে তা আর নতুন করে যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাবার প্রয়োজন হয় না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম চলছে একজনের নেতৃত্বে, যথা রাজা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক দেশেই একজন করে থাকেন, প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান একজনই থাকেন, সেটা অফিস আদালত হউক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হোক বা স্কুল কলেজ হোক। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করার পরও যুগে যুগে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আসছেন। এজন্য প্রধানতঃ স্বার্থান্বেষী, ধর্ম ব্যবসায়ী ও অজ্ঞ পুরোহিতরাই দায়ী।

ধর্মসমূহের ইতিহাস আলোচনা করলেই এর যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ এ একমেবাদ্বিতীয়ম অথবা নিরাকার ব্রহ্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে। অবতারবাদ বা নানা দেবদেবী সম্বন্ধে সেখানে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। এবং মূর্তিপূজার কোনও উল্লেখ নাই। কোরানের বাণী অনুসারে প্রত্যেকটি জনপদেই আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠিয়েছেন। সুতরাং ভারতের মত একটি এতবড় বিরাট জনবহুল দেশেও যে অনেক নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নাই। আল্লাহ আরও বলেছেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (بنى اسرائيل)

আমি সতর্ককারী প্রেরণ ছাড়া কাহাকেও শাস্তি দেইনা। (বনী ইসরাইল:১৫)

বেদের এই মূলমন্ত্রের (একমেবাদ্বিতীয়ম) সাথে অন্যান্য নবীদের (আঃ) প্রচারিত বাণীর হুবহু মিল রয়েছে। দ্রাবিড় ধর্ম অথবা আর্য্য যুগেও যে এখানে সত্যধর্ম প্রসার লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। (মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় এই শাশ্বত ধর্মকেই ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজ নাম দিয়ে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।)

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গঠিত আর্য্য সমাজও সেই পুরাতন তৌহীদপন্থি ধর্মকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। যদি বৈদিকধর্ম নিরাকার স্রষ্টায় বিশ্বাসী বা তৌহীদপন্থি হয়ে থাকে, তাহলে আজ তা ৩৩ কোটি দেবতা সম্পন্ন হাজারো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মে পরিণত হল কী করে? মানুষের জীবনের সাথে ধর্মকে তুলনা করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে ধর্মের বয়স যত বেশি হবে ততই নানারকম কুসংস্কারের দ্বারা এর মধ্যে বিকৃতি ঘটবে। একজন মানব সন্তান শিশুকালে থাকে নিস্পাপ নিষ্কলুশ একটি ফুলের কুঁড়ির মতন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তার স্বভাব ও শরীরের আকৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকবে এবং বৃদ্ধ বয়সে বার্ধক্য ও জরা এমন রূপ ধারণ করবে যে, ৮ মাসের সেই শিশুটিকে ৮০ বৎসর পর আর হয়ত চেনা যাবে না। ধর্মও প্রথমে স্বনিয়মে অটুট থাকে। কিন্তু বছর যত যেতে থাকবে, ধীরে ধীরে নানা রকম কুসংস্কার প্রবেশ করতে থাকবে এবং কয়েক হাজার বৎসর পর এর আসল রূপ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যাবে। কাজেই যে কোন পুরাতন ধর্মের বর্তমান রূপ পরিদৃষ্টে প্রাথমিক অবস্থার ধারণা-ই করা যায় না।

হিন্দুধর্মের নৈতিক শিক্ষা ও পরকালের ধ্যান ধারণার মধ্যেও অন্যান্য ধর্মের সাথে অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে। যেমন চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাকথা বলা, অত্যাচার করা, ব্যভিচার করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মের মত হিন্দুধর্মেও গর্হিত কাজ। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, যম, ইহকাল-পরকাল ইত্যাদির সাথেও বিভিন্ন ধর্মের মিল আছে। অবশ্য পরকাল সম্বন্ধে একটি তফাৎ আছে, তারা এবং বৌদ্ধরা পুনর্জীবনকে এবং অন্যান্য ধর্মীয় লোকেরা শুধু একবার পুনরুত্থানকে পরকাল বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের দেবতাদের সাথে ফেরেস্তা বা Angel দের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্রষ্টা সম্বন্ধে বুদ্ধের নীরবতা গভীর রহস্যাবৃত। তৎকালে ঈশ্বর বা দেবতা বর্জিত কোন ধর্ম তো কল্পনাই করা যেত না। বুদ্ধ কথিত পুনর্জন্ম অথবা নির্বান

লাভ কার দ্বারা সংগঠিত হত? এসব তো মানবিক ক্ষমতার বাইরে। তিনি যদি নাস্তিক হয়ে থাকেন তাহলে পাপ-পুণ্য ও পরকালের কথা বললেন কেন?

এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ অতি প্রাচীন ধর্ম বিধায় অন্যান্য ধর্মের মত পরবর্তীকালে হয়তো এর বিকৃত রূপটাই আমরা দেখছি, আসল রূপ হয়তো অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। এর বহু পরে প্রচারিত খৃস্ট ধর্মে যদি তৌহিদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদ (Trinity), স্রষ্টাকে পিতৃত্ব ও স্বামীত্ব দানপূর্বক মানবিক রূপ দানসহ হাজারো রকমের বিকৃতি ও কুসংস্কার প্রবেশ করতে পারে, তাহলে এর ৫/৬ শত বৎসর পূর্বের বৌদ্ধ ধর্মেও ঈশ্বরের জায়গায় বুদ্ধকে বসানো বিচিত্র কিছু নয়। হয়তো বুদ্ধ স্রষ্টার কথা বলেছিলেন। সমসাময়িক কালের নিয়মও ছিল তাই। হয়ত অন্যান্য ধর্মের মত অতি উৎসাহি পুরোহিতদের কল্যাণে সে স্থানে বুদ্ধকে বসানো হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তার অনুসারিরা স্রষ্টার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছে।

সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের অবস্থাও তদ্রুপ সে দিকে মোড় নিয়েছে। বর্তমানে যেভাবে পীর মুর্শিদের কবরপূজা এবং নানারকম বিজাতীয় কুসংস্কার ঢুকে পড়ছে, হয়তো অল্পদিনের মধ্যে তারা আল্লাহ ও রসুল (সাঃ) উভয়কেই ভুলে যাবে। এজন্যও একধরনের ধর্ম ব্যবসায়ীরা দায়ী। ইসলামের আসল রূপকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এ স্বার্থন্বেষী মহলকে সমাজ হতে চিরদিনের জন্য উৎখাত করতে হবে। এজন্য সাধারণ লোকেরা তেমন বেশি দায়ী নয়। এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রত্যেক ধর্মের বিকৃতির জন্য তথাকার পুরোহিতরাই দায়ী। রাজ্যের অরাজকতার জন্য রাজাকে দায়ী করা হয় এবং চিকিৎসা ও পূর্ত কাজের জন্য যদি ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারকে দায়ী করা হয়, তবে ধর্মীয় বিকৃতির জন্য ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে কেন দায়ী করা হবে না। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক যেহেতু ঐশী বাণী সম্বলিত নয়, সেজন্য এটা আদর্শ ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না। তা বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর বিভিন্ন সুত্রে সংকলিত হয়। এখানে বুদ্ধের একক বাণীই নয়, বিভিন্ন ভিক্ষুদের কথাও স্থান পেয়েছে। সুতরাং এ পাঠে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায় না এবং সঠিক সূত্রের অভাবহেতু ঐতিহাসিক দিক দিয়েও নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ হিন্দু ধর্মের সংস্কারকের ভূমিকাও পালন করতে পারেন। তখনকার দিনের প্রকট বর্ণাশ্রম এবং নানা রকমের অত্যাচার অবিচার ও

কুসংস্কার হতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার নিমিত্তে হয়তো তিনি স্বীয় ধর্মের বা মতবাদের সৃষ্টি করেন। জৈন ও শিখ ধর্মের মত এটা যদি আদি হিন্দু ধর্মের শাখা হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত তর্কের অবসান ঘটতে পারে। কারণ, সমসাময়িক কালের হিন্দু ধর্ম হতে স্রষ্টার ধারণা লাভ করা সহজ ছিল না। তাই এই ব্যাপারে তিনি হয়তবা নীরব ছিলেন।

প্রাচীন আরবের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) এর আবির্ভাবের হাজার বছর পর তারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং নিরাকার আল্লাহর পরিবর্তে তারা নানাবিধ মূর্তিপূজায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে হিব্রু, ব্যবিলন, ফিনিশিয়, গ্রীক্, রোমান প্রত্যেকটি সুসভ্য জাতিই নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাসী এবং মূর্তিপূজক ছিল। প্রতিমাপূজা শুধু একটি কুসংস্কারই নয়, একে একটি মানসিক বিকৃতি অথবা দুর্বলতাও বলা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রীকেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম শিখরে আরোহন করা সত্ত্বেও এই ব্যাধি হতে মুক্ত হতে পারে নাই। তখনকার কথা বাদ দিয়ে আধুনিককালের কথা চিন্তা করে দেখুন। মনে হয় এখনও পৃথিবীর অর্ধেকের চাইতে বেশি লোক মূর্তিপূজক। এর মধ্যে আছেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, যুক্তিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক এবং অন্যান্য চিন্তাবিদেরা। এই অযৌক্তিক আচার অনুষ্ঠান করেই তারা ক্ষান্ত হন না, বরং একে যুক্তিসম্মত প্রমাণ করবার জন্য কতইনা চেষ্টা তদবীর করেন। তাদের সমস্ত বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রজ্ঞা এই মাটির ঢেলাকে জীবন্ত রূপ দান করার প্রয়াসে খরচ করতে কসুর করেন না।

কিন্তু শুধু শুধু খড়কুটা হাতিয়ে কি স্বর্ণের টুকরা পাওয়া যায়? কোথায় সমস্ত বিশ্বের মহা শক্তিশালী অনন্ত অসীম চিরঞ্জীব স্রষ্টা আর কোথায় তাঁর কাল্পনিক প্রতিরূপ একটি মাটির ঢেলা। **তাদের অনেকেই এ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, স্রষ্টা অদৃশ্য সেজন্য তাঁকে পূজা করবার জন্য স্থির থাকে না শুধু Concentration of mind এর জন্যই তারা তাঁর মূর্তি সামনে রেখে আদতে স্রষ্টাকেই অর্চনা করেন।** ভাল কথা! স্রষ্টার রূপ যে আপনার মূর্তিরই মতন সেটা কি করে জানতে পারলেন, অথবা মনোযোগের জন্য নিজ হাতে গড়া জড় মূর্তির পূজার চাইতে নিজ ঔরশ জাত সন্তানকে সামনে রেখে পূজা করা অনেক যুক্তি সংগত হত। আর যারা সরাসরি স্রষ্টার আরাধনা করেন তাদের মনোযোগ কি আপনাদের চেয়ে কম? এক টুকরা জড় পদার্থের চেয়ে

সারা বিশ্বের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে মাথা নত করা কি অনেক বেশি যুক্তি সংগত ও বিজ্ঞান সম্মত নয়?

পুরাতন ঐতিহ্য অথবা ধর্মীয় সংস্কারকে রক্ষার খাতিরে যদি কেউ মূর্তি পূজাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন তাও যুক্তিসংগত হবে না। কারণ, বাস্তব জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথে সমস্ত জড়তা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্বক নিজেকেও বাস্তবসম্মত করা উচিত। তা না হলে সে জ্ঞানী ও নিরেট মূর্খের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। কারণ, জ্ঞানীর কাজ হল নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছা আর মুর্খের কাজ হল অন্ধের মত কারও অনুসরণ অথবা অনুকরণ করা। তথাকথিত অবতারবাদ বা Idea of Incarnation মানব পূজারই নামান্তর। এটা একটি বাস্তব বহির্ভূত নিচ কাল্পনিক ধারণা। এ অণু পরিমাণ পৃথিবীতে বিশ্ব নিয়ন্তার মানবরূপে আবির্ভাবের তো কোন প্রয়োজন নাই। যে কাজ অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব তা নিজে এসে করার তো কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা এক বিচিত্র ব্যাপার যে, একদল উঠে পড়ে লেগেছে মানুষকে ইতর শ্রেণির প্রাণীতে পরিণত করবার জন্য, অপরদল একেবারে ভগবানের আসনে বসাতে ব্যস্ত। মানুষকে মানুষের স্থানে রাখলে ক্ষতি কী? যত কথাই বলা হোক না কেন, ধর্মীয় কুসংস্কার ও সাকার পূজা হতে মানুষকে বিরত রাখা সহজ ব্যাপার নয়।

চার.
শেষ কথা ও প্রত্যাবর্তন

মানব সৃষ্টির আদিকাল হতে হাজার হাজার মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে শুধুমাত্র স্রষ্টার একত্ববাদ, অস্তিত্ব প্রচার ও মূর্তিপূজা অবসানের জন্য। এঁরা কী রকম প্রজ্ঞা ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে মিশন তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়নি তা সাধারণ লোকের দ্বারা কতটুকু সম্ভব হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবুও সে কাজ চালিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে সর্বশেষ নবীর উম্মতগণ কর্তৃক।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। (আলে ইমরান ৩:১১০)

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে সাথে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লহর বার্তাবাহক, তাও বিশ্বাস করতে হবে। কারণ শুধু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হলেই সব দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না, বা সব সমস্যার সমাধান হয়না। স্রষ্টার দেওয়া বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করাই মানব সৃষ্টির

একমাত্র লক্ষ্য। এ বিধান আমরা লাভ করতে সক্ষম হই একমাত্র নবীদের মারফতই। যদি নবীদের (আঃ) উপর আস্থা না থাকে তাহলে সে আদর্শ জীবন বিধানও লাভ করা সম্ভব নয়। যদি কেউ নিজের প্রজ্ঞার বলে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোন নবীকে অনুসরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করে না, বরং নিজস্ব খেয়ালখুশি মত জীবনযাপন করে, তাহলে সে কোনদিনই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেনা। একটা জিনিস অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, নবীগণ মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন, সৎ জীবনযাপন এবং আদর্শ সমাজ গঠনের প্রতি যত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। তার কারণ, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হল যে, মানুষের নৈতিকতার পরিবর্তন।

বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রকৌশল ও অন্যান্য বৈষয়িক কার্যকলাপ মানুষ জীবনধারণের তাগিদে অবশ্যই করবে, এগুলোর জন্য বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সে তুলনায় মানুষের নৈতিক পরিবর্তনের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। বিজ্ঞানের দ্বারা সে আজ চাঁদে পৌঁছেছে, কিন্তু সেই পাশবিক চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা, একটু লক্ষ্যণীয়। সুতরাং নবীদের দেওয়া আদর্শ ছাড়া কেউই নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না।

শুধু নৈতিকতার ব্যাপারে নয়, অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপারেও নবীর (সাঃ) দেওয়া বিধান সর্বোত্তম। সমাজতন্ত্রে ও ধনতন্ত্রে সম্পদ ভোগের, সুষম বন্টনের এবং সম্পদের মালিক করা হয়েছে জনসাধারণকে। অথচ একদিকে তা ভোগ করছে রাষ্ট্র পরিচালকবৃন্দ এবং অপরদিকে মালিক হয়েছে কতিপয় পুঁজিবাদী। ইসলামে সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ এবং জনসাধারণ শুধু আমানতদার ও তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। ইসলামের নির্দেশ মোতাবেকেই তা ব্যয় ও বন্টন করতে হবে। নিজের খেয়ালখুশি মত বিলাস বাহুল্যে ব্যয় করার অনুমতি নেই। সার্বভৌমত্বের ব্যাপারেও তদ্রূপ।

অন্যান্য মতবাদে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের, কিন্তু ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। কারণ, মানুষ নিজস্ব সীমিত জ্ঞান ও স্বভাবজাত ত্রুটি বিচ্যুতির দ্বারা নির্ভুল ও সঠিক জীবন বিধান রচনা করতে অক্ষম। একমাত্র

স্রষ্টার বিধানই নির্ভুল ও ত্রুটিবিহীন হতে পারে। যিনি আসল মালিক তিনিই হবেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কতিপয় অদৃশ্য, অজানা ও গোপনীয় বিষয়েও বিশ্বাস স্থাপন করাও প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য। জ্বীন, ফেরেস্তা, স্বর্গ, নরক, ভাগ্য, শেষ বিচারের দিন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ইত্যাদি হল এই বিষয়ের অন্তর্গত। এইসব বিষয় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে হলেও অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু নয়। প্রত্যেকটিকে ভালভাবে চিন্তা করলে তা একেবারেই বাস্তবসম্মত মনে হয়।

প্রথমে জ্বীন ও ফেরেস্তাদের কথা আলোচনা করা যাক। কোরআন শরীফের মতে জ্বীন আগুনের তৈরি এক প্রকার জীব, যারা ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তাদেরকে মানুষের চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। অর্থাৎ তারা একপ্রকারের সূক্ষ্ম অশরীরি প্রাণী। মানব সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য ছিল। তাদের অত্যাচার, অবিচার ও খুন খারাবিতে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের দ্বারা তাদের বন জঙ্গল এবং অন্যান্য দূর্গম স্থানে বিতাড়িত করেন এবং তদস্থলে মানুষের আধিপত্য কায়েম করেন। তারা এখনও পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে অথচ আমরা দেখতে পারছি না। তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনেকটা মানুষেরই মতন এবং মানুষের মত তাদেরও ভাল মন্দ কার্যকলাপের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদেহি করতে হবে। ফেরেস্তারা হলেন নূর বা আলো ও জ্যোতির তৈরি। তাঁরা নিস্পাপ, স্ত্রীও নন পুরুষও নন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রিপু হতে তাঁরা মুক্ত। যাকে যে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে সে কাজ ছাড়া আর কিছু জানেন না। তাঁরাও জ্বীনের মত অশরীরি জীব এবং ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন, ইতর ও নোংরা প্রাণী ছাড়া। সুতরাং এখন প্রশ্ন হতে পারে এই ধরনের কোন প্রাণী থাকা সম্ভব কিনা?

যে যুগে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রাণীও অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে সেখানে এই ধরনের প্রাণী থাকে কি করে! যে যুগে হাতে নাতে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু সহজে বিশ্বাস করতে চায় না, জ্বীন ফেরেস্তাদের কথা কি করে প্রমাণ করা যায়? হ্যাঁ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় বটে, কিন্তু যন্ত্রপাতি দ্বারা দেখানো সম্ভব নয়। প্রথমে জ্বীনের কথা ধরুন। যেহেতু এরা আগুনের তৈরি, সেই জন্য আগুনের বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে বিদ্যমান। আগুন যেমন গোপনও থাকতে পারে আবার প্রকাশও পেতে পারে, এরাও তদ্রূপ। বাতি যখন নিভিয়ে দেওয়া হয় তখন আগুন

এইভাবে উধাও হয়ে যায় যে, এর কোন চিহ্নও বাকি থাকে না। আবার আগুন যখন দেশলাইয়ের কাঠি, গাছ, বাঁশ এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থের মধ্যে সুপ্ত থাকে, তখন তাকে কেউই দেখতে পায় না।

সুতরাং সে আগুনের সাথে যখন প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হবে তখন তা ইচ্ছামত আত্মপ্রকাশও করতে পারবে, গোপনও থাকতে পারবে। ফেরেস্তাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এরা যেহেতু জ্যোতির তৈরি, এদের জ্যোতির আত্মগোপন থাকা ও প্রকাশ পাওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বৈদ্যুতিক আলো ও শক্তির সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বাইরে তা যে নাই এ কথা জোর করে কখনও বলা যায় না। পদার্থের শক্তিতে পরিণত হওয়া এবং শক্তি পদার্থে পরিণত হওয়া হতেও এদের ইচ্ছামত আত্মপ্রকাশ ও গোপন থাকার কথা সমর্থন করা যায়। কেয়ামত বা মহাপ্রলয় যে একদিন ঘটবে তাতেও অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। সমগ্র বিশ্ব যার আকর্ষণে বিরাজ ও বিচরণ করছে, সে আকর্ষণটি বিচ্যুত হলেই তো সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। যে চুম্বক শক্তির আকর্ষণে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র মহাশূন্যে বিচরণ করে আসছে তা একদিন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, যার ফল হবে তাদের কক্ষচ্যুতি এবং শেষে পরস্পর সংঘর্ষ ও অনিবার্য ধ্বংস।

এ পৃথিবীতে এরকম কতকিছুই না ধ্বংস হচ্ছে। কোন কিছু দীর্ঘদিন যাবৎ টিকে থেকে তারপর ধ্বংস হয় আবার কোন কিছু কম সময়েই ধ্বংস হয়। এ গ্রহ নক্ষত্রগুলো না হয় তাদের বিরাটত্ব এবং নির্মাণ কৌশলের জন্য বেশ দীর্ঘকাল টিকে রইল। কিন্তু এদের শেষ একদিন নিশ্চয় আছে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বা পরকালও অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু নয়। শক্তিচালিত যানবাহন বা কলকারখানার মূল হল ইঞ্জিন। যিনি ইঞ্জিন তৈরি করতে পারেন তার জন্য এর উপযুক্ত Body তৈরি করার মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। মানুষের মূল হল আত্মা এবং শরীর হল এর আধার। শরীর ধ্বংস হতে পারে কিন্তু আত্মা অমর। ইঞ্জিন থাকলে যেমন এর জন্য আর একটা Body নির্মাণ করা কঠিন ব্যাপার নয়, ঠিক আত্মার জন্যও শরীর তৈরি হওয়া অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু নয়। কোরআনে এর সমর্থনে দু'রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ বলা হয়েছে, যে আল্লাহ শূণ্য থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ, তিনি পুনঃনির্মাণ করতে কেন অক্ষম হবেন?

শেষ কথা ও প্রত্যাবর্তন

অতি সত্য কথা। যে বৈজ্ঞানিক সদ্য নতুন কোন যন্ত্র আবিস্কার করতে সমর্থ হবেন, তিনি সে রকম একটি যন্ত্র মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করতে কেন সমর্থ হবেন না? আর একটি উদাহরণে বলা হয়েছে, যে জমির তৃণরাজি প্রখর সূর্যতাপে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, যেখানে প্রাণের কোন চিহ্নও টিকে থাকা সম্ভব হয় নাই, সেখানে বৃষ্টি বা সেচের পানি পাওয়ামাত্র সবুজের জন্ম কীভাবে হয়? মৃত তৃণের মধ্যে কীভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়? যদি বলেন যে, অন্য জায়গা হতে বাতাসের সাহায্যে নানা রকমের বীজ উড়ে এসে সেখানে পতিত হয়, অথবা পাখিরা নানা রকম ফলের বীজ বহন করে নিয়ে আসার ফলে সেখানে সবুজের সৃষ্টি হয়। আসলে কোনটাই যুক্তিসংগত নয়, কারণ, হয়তো সেই স্থানের শতশত মাইলের মধ্যে কোন শস্যশ্যামল জায়গাই নেই। যেখান থেকে সহজে বীজ উড়ে আসতে পারে। অথবা বাতাসের সাথে উড়ে আসলেও আগুনের হলকার মত উষ্ণ মরু প্রান্তরের মধ্যেই এটি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। পাখিরা বহন করে আনতে পারে ঐসব ফলের বীজ যেগুলো এরা খায়, কিন্তু যেসব তৃণলতার ফল তারা খায়না তা কী করে আসে? এটি দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ পানি, মাটি এবং সূর্যতাপের সমন্বয়ে নতুন জীবকোষের সৃষ্টির দ্বারা অথবা পূর্বেকার মৃত বীজ অথবা শিকড়ের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চারের ফলে। প্রথমটার জন্য দীর্ঘকাল সময়ের দরকার, অথচ দেখা যায় যে, পানি তাপ পাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তৃণলতাদির জন্ম হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্বিতীয় উপায়ের মাধ্যমেই এদের পুনর্জন্ম সম্ভব।

কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, মানবজাতিকে মাটি হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে, এদের দেহ মাটির মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে, আবার এ মাটি হতেই তাদের পুনরুত্থান পূর্বক স্রষ্টা সমীপে হাজির করা হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (المؤمنون:12/الحج:5)

মানুষ যে মাটিরই সৃষ্টি তাতে সন্দেহ করবার কী আছে?

(আল মুমিনুন ১২/ আল-হাজ্জ ৫)

মাটি হতে উৎপাদিত এবং মাটিরই রসসিক্ত ফলমূল হতেই মানুষের বীর্যের সৃষ্টি হয়। সে বীর্য স্ত্রীর বাচ্চা দানিতে পৌঁছবার পর সে ফলমূলের নির্যাস আহরণ করে বর্দ্ধিত হতে থাকে এবং জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মাটি হতে

উৎপাদিত শস্যাদির দ্বারাই জীবনধারণ করতে হয়। ফলমূল গাছ-গাছড়া মাটিরই প্রতিরূপ।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে ধাতব দ্রব্য অথবা গাছ-গাছড়ার নির্যাসকে যেভাবেই পরিবর্তিত করা হোক না কেন, কিন্তু মূল একই। স্যাকারিনের রূপ যাই হোক না কেন, অথবা কৃত্রিম রবারের রং যাই হউক না কেন, কিন্তু এদের মূল পাথুরে কয়লা এবং দুধের ছানা ছাড়া আর কী হতে পারে? তৃণ-লতাদির মত মানুষও ক্রমান্বয়ে এ মাটির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মহা প্রলয়ের পর পৃথিবীতে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে যাতে করে মানবজাতি তাদের জীবন পুনরায় ফিরে পায়, সুরায়ে ত্বীন দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে যদি প্রাকৃতিক উপায়ে জীবকোষ সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং ক্রমান্বয়ে আকৃতিও লাভ করে তা হলে ভিন্নতর পরিবেশে মৃত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করতে পারবে না কেন? শুষ্ক ও মৃত তৃণমূল হতে যদি পুনরায় তৃণের জন্ম হতে পারে তাহলে মৃত মানুষের জীবাশ্ম হতে মাটির বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে জীব কোষের সৃষ্টি ও আকৃতি লাভ করতে পারবে না কেন?

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং ধ্বংস নিজস্ব গতিতেই পরিণতি লাভ করবে এবং এতে অন্যথা হবে না।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

এটাই আল্লাহর মৌলিক রীতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (আর-রূম ৩০:৩০)

বৃক্ষ লতাদির মত মানুষের জীবকোষও মাটি হতে রস আহরণ পূর্বক বর্ধিত হতে পারে, যেমন মাতৃগর্ভে বর্তমানে নাভি নালির মাধ্যমে রস আহরণ পূর্বক সন্তান বেঁচে থাকছে। উদ্ভিদের জন্মের জন্য মাটির সাথে কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ প্রাণী ও গাছপালার জীবাশ্মের প্রয়োজন হয়। মাটির অভ্যন্তরে কীটপতঙ্গ কি জন্ম নিচ্ছে না? মানবজাতির আদিপিতা হযরত আদম (আঃ) কে শুধু মাটি হতে তৈরি করা হয়নি, তাঁর বংশধররাও আজ পর্যন্ত মৃত্তিকা রসের দ্বারা জন্ম লাভ করছে না? পুনরুত্থান ও পুনর্জন্ম এক কথা নয়। বিশেষ করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও সিন্টো ধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে। মৃত ব্যক্তির প্রাণ বার বার নতুনভাবে পৃথিবীতে জন্ম লাভ করা কিছুতেই যুক্তি সংগত হতে

পারে না। বার বার যদি মৃত আত্মাই ঘুরে ফিরে জন্ম লাভ করে থাকে তাহলে এত মানুষ বাড়ছে কী করে? এ রকম হলে তো জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকবার কথা।

পরকাল বা শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস ইসলাম, ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সমূহের অন্যতম। এ পৃথিবী মানবজাতির জন্য এক কর্মশালা। ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দকাজের শাস্তি সুষ্ঠু বিচার পূর্বক শেষ বিচারের দিনই নির্ধারিত করা হবে। যুক্তিসংগত কারণেও শেষ বিচারের দিনের অস্তিত্ব অবশ্যই বাঞ্চনীয়। কারণ, এই পৃথিবীতে অনেক লোক এমন আছে, যারা আজীবন নিরীহ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার-অবিচার চালিয়ে আসছে অথচ ইহকালে তাদের কোন শাস্তি হয়নি। আর এমন লোকও অনেক আছেন যারা ভাল কাজের মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন অথচ ইহকালে তারা পুরস্কৃত হননি। তাহলে কি সে অত্যাচারকারীদের বিনাশাস্তিতে রেহাই পাওয়া উচিত এবং সে পরোপকারী মজলুমদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাওয়া কি উচিৎ?

মানবিক অধিকারের অর্থ হল প্রত্যেকের বেঁচে থাকার, খাওয়া, পরা এবং মান সম্মান রক্ষার নিশ্চয়তা থাকা। যদি সে অধিকার কেউ হরণ করে এবং বিনা শাস্তিতেই ইহকাল ত্যাগ করে তবে তার শাস্তি কে বিধান করবে? তবে কি এ দুনিয়া কেবলমাত্র শক্তিমত্ত, জালেম, ডাকাত ও সবলদেরই আখড়া? দুর্বলদের উপর সবলদের নিপীড়নের একটানা ও একতরফা খেলার জন্যই কি এ বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে? একজন তরুণ, যে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে জীবনকে ভোগ করতে পারে, সে কোন পুরস্কারের লোভে পরের তরে নিজ প্রাণটি বিসর্জন দিবে? বুঝলাম তার আত্মত্যাগে আর দশজন উপকৃত হল, কিন্তু সে নিজে পেল কী? যদি বলেন তার নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে, আত্মত্যাগী বীর হিসেবে তাকে অমর করে রাখা হবে, কিন্তু সে তো সে খ্যাতি ও যশ জীবদ্দশায় ভোগ করতে পারল না, মৃত্যুর পর সে তো আর সে শহীদ মিনার কখনও দেখতে পাবে না। তাঁকে তিরস্কার করা হোক বা স্তুতি গীত হউক কিছুতেই সে শুনতে পাবে না। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য যদি শুধু ভোগ বিলাস হয় এবং মৃত্যুর পর যদি চীনা মাটির বাসন কোসনের শো-পীসের মত পরিণতি লাভ করে তাহলে বেচারার জীবনটা বৃথা গেল না?

মনে করুন 'খ' নামক ব্যক্তি 'ক' কে বিনা কারণে হত্যা করল। 'ক' তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, তার মৃত্যুতে পরিবারবর্গ পথে বসে। অপর দিকে 'খ' এর সে অঞ্চলে দোর্দণ্ড প্রতাপ। তার শাস্তি বিধান করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কাজেই সে বিনাশাস্তিতে রেহাই পেয়ে গেল এবং পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করল। আপনারা নিশ্চয় বলবেন তার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এ শাস্তি কে বিধান করতে পারেন? 'ক'-ইবা বা তার সর্বনাশের কী প্রতিকার পেল? মানুষ লোকচক্ষুর অগোচরে অজস্র ভাল ও মন্দ কাজ করতে পারে, গোপন কারসাজির দ্বারা কারও সর্বনাশ করতে পারে, আবার শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে থেকেও অনেকের প্রাণও রক্ষা করতে পারে। এর শাস্তি বা পুরস্কৃত করার ক্ষমতা কি কোন মানুষের আছে? কুচিন্তা, কুমতলব, দুরভিসন্ধি অথবা সৎ চিন্তা, সৎ উদ্দেশ্য ও সরলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার কোন মিটার মানুষের কাছে আছে কি? এসব প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র নিজের বিবেকের কাছেই করতে হবে, অন্য কারও কাছে নয়।

যে সব কাজ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য তা সম্পাদন করার জন্য নিশ্চয় একজন আছেন যিনি যথাসময়ে একদিন যার যা প্রাপ্য তার বিধান পর্ব শেষ করবেন। পাপীদের জন্য যার যার পাপের অনুপাতে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, আর পুণ্যবানদের জন্যও যথাযোগ্য পুরস্কারের বন্দোবস্ত করবেন। আবার অনেকের মতে সবকিছু আধ্যাত্মিকভাবেই সম্পন্ন হবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পাপ পুণ্যের হিসাব নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার সবকিছুই আধ্যাত্মিকভাবেই সম্পন্ন হবে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে বেশি যুক্তিতর্ক দ্বারা তা প্রমাণ করবার প্রয়োজন নাই। কারণ স্বপ্নলোক আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিরূপ বিশেষ।

কেউ যদি স্বপ্নলোকে আনন্দ, সুখ, দুঃখ, ব্যথা, ভয়-ভীতি অনুভব করতে পারে তাহলে আধ্যাত্মিক জগতেও বিচার সম্পাদন হতে আরম্ভ করে স্বর্গীয় সুখ শান্তি ও নরক ভোগ করা সম্ভব। আধ্যাত্মিক জগত যদি সত্যই স্বপ্নলোকের মত হয় তাহলে এটি হবে স্থান কাল পাত্র এর উর্ধ্বে এক বিচিত্র জগত। কারণ স্বপ্নজগতের কোন সীমারেখা নাই। আপনি পালংকের উপর ঘুমিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গমনাগমন করতে পারেন, বিপুল জনসমাবেশ দেখতে পান, নানা রকমের সুস্বাদু খাদ্য খেতে পারেন অথচ এর জন্য আপনার যাতায়াত পথখরচ লাগে না, গণসমাবেশের জন্য বিরাট মাঠের দরকার হয় না এবং খাবারের জন্য বিশেষ কোন আয়োজনের বা খরচের প্রয়োজন নাই। যা সংঘটিত হতে পুরো

দিন অথবা কয়েক ঘন্টা প্রয়োজন হত তা হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। হয়তো আপনি স্বপ্ন দেখেন কয়েকশ মাইল ভ্রমণের, অথবা কয়েক হাজার মাইল দুরবর্তী কোন দেশে গমনের, অথচ আপনি দিব্যি আরামে পালংকে শুয়ে আছেন এবং ঘুমিয়েছেন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য।

এ আধ্যাত্মিক জগতে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। সুতরাং সেখানে পার্থিব শরীর ফিরে পাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু কোরআন, হাদীস, বাইবেল এবং তালমূদ পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, পুনরুত্থান ও পরকাল সত্যি সত্যিই সশরীরে সংঘটিত হবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে হবার কোন রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি স্রষ্টার উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে পরকালেও বিশ্বাস থাকতে হবে। যিনি শূণ্য হতে সব কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁর পক্ষে তা পুনঃ তৈরি করা কঠিন বা অসম্ভব কিছুই নয় (এ কথা কোরআনে বার বার বলা হয়েছে)। অনেকেই মনে করে যে, পার্থিব জীবনটাই সব কিছু, স্বর্গ বল, নরক বল, সুখ বল, দুঃখ বল সব কিছুর মূলে এই ৬০/৭০ বৎসর এর পার্থিব জীবনটাই বাস্তব এবং সার্থক। যদি তা হয়, তবে এই দুনিয়ায় ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে ভাগ্যবান যে জীবনটাকে বিলাসিতার মাধ্যমে পুরোপুরি উপভোগ করতে পেরেছে, তার চরিত্র বা আয়ের উৎস যাই হোক না কেন। আর ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় বোকা যে আদর্শ চরিত্র, সততা, ও দয়া দক্ষিণা রক্ষা করার জন্য আজীবন দুঃখ কষ্টটাকে আলিঙ্গন করেছে ও অভাব অনটনের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, অথচ ইচ্ছা করলে সেও অসদুপায়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হতে পারত। আর ঐ সব তরুণ ও যুবকেরা যারা দেশের তরে দশের তরে নিজের সম্ভাবনাময় জীবনটা বিলিয়ে দিয়েছে, অথচ না পারল দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে জীবনরস উপভোগ করতে, না রইল পরকালে পুরস্কারের কোন আশা। দুনিয়া আখেরাত দুইটাই বরবাদ।

বুদ্ধিমান ঐসব শঠ, বাটপার, চোর, ডাকাত, খুনি ও লম্পটেরা যারা শান্তিপ্রিয় জনতার মেহনতের ফলকে দু'হাতে লুণ্ঠন করে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তোলে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে খুন করে গোটা পরিবারটাকে পথে বসাল এবং অবলা নারীদের সতীত্ব হরণ পূর্বক দুই গোঁফে তা দিয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াল। আর যারা ভুক্তভোগী, তারা সমাজের জঞ্জাল, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতভাগার দল। ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, ইহকালে

যার অবাধ গতি, দুর্বার শক্তি, পরকাল বলতে কিছুই মানে না। সে যত অত্যাচার অবিচারই করুক, তার শাস্তি বিধান করবে কে?

কবি বলেছেন, "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর/মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতেই সুরাসুর।

অতি সত্য কথা! দুনিয়া বাস্তবিকই স্বর্গ যতসব অত্যাচারী, অবিচারী, লুটেরা, শোষক, মদ্যপ, লম্পট, মিথ্যুক আর প্রতারকদের জন্য; আর যতসব নিরীহ, সত্যবাদী, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, দুর্বল, দীনহীন, দরিদ্র, অনাথ, বিধবাদের জন্য নরকই বটে। যদি পরকাল বলতে কিছুই না থাকে এবং এ পার্থিব জীবনটাই সবকিছু হয়, তাহলে হেসে-খেলে জীবনটা যারা কাটিয়ে দিতে পারে তারা লাভবান নয় কি? পৃথিবীতে অন্যায় কাজ করে শাস্তি পায় ক'জনে? এবং অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয় অনেকেই, কিন্তু তার বিচার পায় ক'জনে? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দৃষ্ট হয় যে, যুগে যুগে দাম্ভিক ক্ষমতালিপ্সু নৃপতি, সামন্ত প্রভু ও ধনিক বনিকেরাই বার বার স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরকালকে অস্বীকার করে আসছে।

যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, সমসাময়িক ক্ষমতাবান শোষকেরাই প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে। নমরূদ, শাদ্দাদ, ফেরআউন, কারূনেরা যুগে যুগে সত্য পথের অন্তরায় হয়েছে। মহাপুরুষদের ডাকে সাড়া দিয়েছে বার বার দীনহীন, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনতাই। স্রষ্টার আইন প্রচলিত হলে, পরকালের ভয় থাকলে যে তাদের অসীম ক্ষতি হবে ও অবাধ শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে– এ কথা তারা খুব ভাল করে জানত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধুনা সেই জালেম শোষকদের অনুসৃত পন্থাকেই শোষণের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে নিজের কৃতকর্মের জন্য জনতা বা স্রষ্টা কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করেন না, তার হাতে অপরিসীম ক্ষমতা দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? তার অত্যাচার অবিচারকে প্রতিহত করবার জন্য অন্য কোন পন্থা আছে কি? যেন নিরস্ত্র জনতাকে লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া অথবা ভেড়ার পাল রক্ষণের জন্য নেকড়েকে দায়িত্ব দেওয়া। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য নাস্তিকতার অপরিহার্য্যতা আর একটি বিশেষ কারণেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সর্বহারার রাজত্ব এবং শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের নামে এমন কতগুলো জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজ করতে হয় যা

সম্পাদনে যাদের পরকালের ভয় এবং নৈতিকতাবোধ আছে তাদের দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। একমাত্র খোদাদ্রোহী নাস্তিক ছাড়া এ মানবতাবিরোধী কাজ আর কেউ করতে পারে না।

কে নাকি বলে গেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'– কথাটি দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। মানুষকে যে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন– কাদের উপর? এমন কি স্রষ্টার উপরও? (খোদা পানাহ্)। কথাটির অর্থ যদি এই হয়ে থাকে যে অন্যান্য জীব জন্তুদের তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, তাহলে বলবার কিছুই নাই। আর যদি অন্য অর্থ ধরে নেওয়া হয় তাহলে বলবার অবশ্যই কিছু আছে। আমি প্রথমেই মানুষের শক্তি, সামর্থ, জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। মানুষ হয়ে মানুষকে আর কালিমা লিপ্ত করতে চাই না। মোটকথা মানুষের মধ্যে এমন অনেক জঘন্য দোষ আছে যা সচরাচর অন্যান্য হিংস্র জীবদের মধ্যেও দেখা যায় না। সেগুলো একে একে উল্লেখ করলে সবাই বলতে বাধ্য হবে যে, সবার উপরে মৌমাছি সত্য, পিপিলিকা সত্য, গরু সত্য, হাতি সত্য....। সুতরাং এ ধরনের Vague, অবান্তর ও স্থুল উক্তি করা মোটেই ঠিক নয়। কারও স্তুতি গাইতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া বাস্তববিমুখী। দিল্লীশ্বর, ভারতেশ্বরকে জগদীশ্বর বলে বাদশাহকে খুশি করা যায় কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়।

যে পার্থিব জীবনের জন্য মানুষ এত পাগল, এর এক মুহূর্তেরও কোন নিশ্চয়তা নাই। যে ধনসম্পদ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে তারও কোন স্থায়িত্ব নাই। কত নৈসর্গিক, কত দৈব দুর্বিপাক, কত নিত্য-নৈমত্তিক দুর্ঘটনার মধ্যেই না মানুষ বেঁচে আছে, যা দ্বারা সে যে কোন মুহূর্তে সর্বশান্ত হতে পারে। কিন্তু তবুও মানুষ পাগলের মত সে অনিশ্চয়তা ও কুহেলিকার পিছনে ধাবিত হয়ে আসছে এক আবহমান কাল হতেই। যে সব রাষ্ট্রে নাস্তিকতা একটি জাতীয় ধর্ম, তথায় জনসাধারণ মানবেতর জীবনযাপন করছে মাত্র, স্বর্গীয় সুখ অনুভব করছে বলে বিশেষ মনে হয় না। যেমন মনে করুন, আমাদের প্রাচ্য দেশে গরু বা মহিষ চাষাবাদের জন্য প্রধান অবলম্বন। এক প্লট জমি চাষ করতে একজোড়া গরু বা মহিষ প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাদের তুলনায় গৃহস্থের পরিশ্রম নগণ্য। কিন্তু উৎপাদনের অনুপাতে গরু বা মহিষ কী ভোগ করতে পারে আর গৃহস্থের লাভের পরিমাণ কী তাহা সহজেয় অনুমেয়। গরু মহিষ পেতে পারে জীবন ধারণের মত খড়কুটা আর থাকার মত

গোয়াল ঘর, যা তাদের শ্রমের তুলনায় অতি নগণ্য আর মালিক ভোগ করবে যত শস্য।

তথাকথিত সমঅধিকারের দেশসমুহের কথায়ও এ উদাহরণ প্রযোজ্য নয় কি? তথাকার মজুরেরা যারা ক্ষেত–খামারে, কল-কারখানায়, খনিতে কাজ করে, মোট উৎপাদনের অনুপাতে তারা কী ভোগ করতে পারে। এবং, রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটির ভোগের পরিমান কতটুকু? তারাও পায় জীবনধারণের মত খাদ্য, সাধারণ পরিধেয় এবং থাকবার জন্য একটি ছোটখাট বাড়ী। এর বিনিময়ে যে স্বাধীনতা তারা ভোগ করে তার তুলনাও একমাত্র ঐ সব জন্তুদের সাথে করা যেতে পারে।

এত কিছুর পরেও এটা প্রমাণিত যে, বিবেক, জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় প্রাণীকূলে মানুষই সেরা। কাজেই এটা বুঝার অসুবিধা হবার কথা না যে, এই দুনিয়াটাই শেষ কথা নয়। দিনশেষে সৃষ্টিকর্তার নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নাই।

মহান আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিন, সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

॥ আমীন ॥